প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : জুন ১৯৫৫

মূল্য : ৭·০০

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে

হৃদয়ের শব্দ

আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে একটা হালকা ধরনের এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছিল। ঘুমের মধ্যেও যেন সুনীথ তার শব্দ শুনতে পায়।

শীতের দুপুর। চারিদিকে কেমন ঝাপসা ঝিম ধরা ভাব। এই থমথমে পরিবেশে হঠাৎ প্লেনের আওয়াজটা একটা ধারালো অস্ত্রের মতো কেটে কেটে বসে যাচ্ছিল। যেন খুব দূর থেকে আলগা হাতে এক বিশাল করাত টানছে কেউ। হাল ফ্যাশানের কোন এয়ারক্র্যাফট হলে বা জেট ইঞ্জিন হলে শব্দটা এতক্ষণ ঝড়ের মতো সারা আকাশ মাতিয়ে মুহূর্তের মধ্যে আবার মিলিয়ে যেত। কিন্তু এর চলায় তেমন বেগ নেই। ছোটখাটো মাপের এক ইঞ্জিন লাগানো পলকা মেশিন নিজের খেয়ালে ধীরে-ধীরে উড়ছে। নিতান্তই অলস মন্থর একটা ভঙ্গিতে যেন সে ছুটির দিনের দুপুর উপভোগ করে চলেছে। অনেক দূর থেকেও তাই তার একটানা গ্র্যাঁ-আঙ-গ্র্যাঁ-আঙ শব্দটা সমানে কানের মধ্যে বিঁধতে থাকে। কেমন কাঁপা কাঁপা একটা ঢেউ। কখনো খুব স্পষ্ট, কখনো খুব মৃদু একটা কাতরানির মতো।

গভীর ঘুমের মধ্যেও থেকে থেকে, সুনীথ এপাশ ওপাশ করে। উড়ো-জাহাজের রিনরিনে সুরটা তার মাথার মধ্যে ঢুকে ঘুরপাক খাচ্ছে। অবশেষে সেই ডাকটা এক ধাক্কায় জাগিয়ে তুলল তাকে। ধড়মড় করে উঠে বসে সে। শব্দটা তখন প্রায় মিলিয়ে এসেছে। তবু কান খাড়া করে তার শেষ রেশটুকু ধরবার চেষ্টা করে। আর একটু পরিষ্কার ভাবে আওয়াজটা শুনতে পেলে সে প্রায় নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারত এটা কী ধরনের মেশিন। টাইগার মথ, না পুষ্পক, না এল ফাইভ! বোনাঞ্জা বা চীফ মঙ্ক হলেও সে ঠিক বুঝতে পারত।

হালকা কোন প্লেন উড়ে যাওয়ার শব্দ পেলেই সে এখন এমনি এক অদ্ভুত শিহরন অনুভব করে। সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ কান দুটো সতর্ক হয়ে ওঠে। শব্দের অনুসরণে আকাশের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে আরম্ভ করে তার উৎসকে। স্নায়ুমণ্ডলীর গভীরে কোথাও তখন শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়ে তাকে আঘাত করতে থাকে। এরোপ্লেনের কক্‌পিট থেকে নেমে আসার পর যেমন সদ্য উড়ে আসার রেশটা বুকের মধ্যে তিরতির করে, ঠিক তেমনি এক অনুভূতি। যেটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাখে তাকে। চোখের সামনে

ছবির মতো ভেসে ওঠে বিশাল বিমান বন্দর, একদিকে ফ্লাইং ক্লাব, কন্ট্রোল টাওয়ার; অন্যদিকে এয়ারফোর্স স্টেশান। ফ্লাইং ক্লাবের আকাশে সারাদিন নানা ধরনের প্লেনের আনাগোনা, শিশির-ভেজা নির্জন মাঠের মধ্যে ধূ-ধূ রানওয়ে; জোড়া পাখা লাগানো হলুদ ফড়িংএর মতো সেই প্রিয় প্লেনখানা, সকালের মনোরম আকাশে একটানা সোজা উড়ে বেড়ানো! কক্‌পিটের সামনে বসা স্কোয়াড্রন লীডার ডেভিড, রানওয়ের একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা রিখি, কন্ট্রোলের বারান্দায় পাইপ মুখে মিঃ চৌধুরী—একটা ঘোরের মধ্যে যেন সে সব দেখতে পায়।......

ফ্লাইং ক্লাবের আকাশে টাইগার মথ উড়ছে একখানা। হলুদ টাইগার মথের গায়ে গাঢ় কালো রঙে লেখা : ভি টি—ডি ই আর। সংক্ষেপে ডিয়ার। বড় বিশ্বস্ত এয়ারক্র্যাফট। অনেক পাইলটকে আজ পর্যন্ত সে কোলে-পিঠে করে ওড়া শিখিয়েছে। হলদে প্রজাপতির মতো ডিয়ার জোড়া পাখা মেলে বাতাস কাটছে। উজ্জ্বল রোদ্দুরের রঙ তার বুকে। পেটের নিচেয় দুদিকে দুটো ডানা, আর এক জোড়া পিঠের ওপরে। ছোট কক্‌পিটের সামনে পিছনে মাত্র দুটো সীট। দু জায়গা থেকেই চালানোর ব্যবস্থা। হাতের সামনে আছে একটা করে লম্বা লোহার রড—প্লেনের কন্ট্রোল স্টিক। স্টিকটা পিছনে টানলে উঁচুতে মাথা তোলে ডিয়ার, সামনে ঠেললে সোজা ডাইভ দেয়। বাঁ দিকে রয়েছে থ্রটল, ইঞ্জিনের জোর বাড়িয়ে বা কমিয়ে নেওয়ার জন্যে। পায়ের তলায় রাডার। খুব ছিমছাম সরল মেশিন। মাথার ওপর কোন আচ্ছাদন নেই: সহজেই ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকের সব কিছু ভাল করে দেখে নিতে পারে পাইলটরা।

ডিয়ারের কক্‌পিটের মধ্যে হেলমেট আঁটা দুটো মাথা স্পষ্ট দেখা যায়। সামনে স্কোয়াড্রন লীডার ডেভিড, পিছনে দাশগুপ্ত। দাশগুপ্ত সবে ফ্লাইং শুরু করেছে। এখন ওর শুধু ঠিকমত আকাশে ওঠা আর নামার অনুশীলন।

সুন্দর আবহাওয়া। দিগন্তরেখা পরিষ্কার। দমকা হাওয়া বা ক্রস উইন্ডের কোন চিহ্ন নেই। রানওয়ের এক পাশে ডোরা কাটা মোজার মতো হাওয়া নিশানটা চুপসে ঝুলে আছে। খুব মৃদু দক্ষিণের হাওয়া। ডোরা-কাটা উইন্ড সকস্‌টাকে ফোলাবার পক্ষে যা যথেষ্ট নয়। হাওয়া অনুযায়ী এখন সব প্লেনের দক্ষিণমুখী ওঠা-নামা। রাডারে সামান্য পা ছুঁইয়ে রেখে রানওয়ে ধরে নির্ভাবনায় কিছুক্ষণ দৌড়ে চলা; তারপর ঠিকমত স্পীড আসতেই কন্ট্রোল স্টিকটাকে মুঠোর মধ্যে টেনে আকাশে ভেসে পড়া। বারবার একই ভঙ্গিতে যেন ছবির মতো ঘটছে।

বাঁ দিকের আকাশে একটা পাক ঘুরে আবার নামতে আসছে দাশগুপ্ত। প্রপেলারের গর্জনটা থেমে গেল। সোজা গ্লাইড করে রানওয়ের ওপর নেমে আসছে ওরা। মাটিতে বসার আগে পাখিরা যেমন ডানা মেলে দেয়। ঠিক তেমনি ভাবে নেমে আসছে প্লেনটা। কালো স্রোতের মতো রানওয়েটা এখন দ্রুত ফুলে উঠছে ওদের চোখের সামনে।

হঠাৎ ওপরে মাথা তুলতে শুরু করে ডিয়ার। কণ্ট্রোল স্টিকটা পিছনে টানছে দাশগুপ্ত। এইবার মাথাটা আরও তুলে লেজটা মাটিতে এনে পোষ-মানা পাখির মতো বসে পড়বে ডিয়ার। তারপর তিন চাকার ওপর বসেই সোজা দৌড়োবে রানওয়ে ধরে।......

—ফাইন! ফাইন ল্যাণ্ডিং! তোমার কী মনে হয় সানিথ?

মিসেস রিখি ডেভিড সুনীথের দিকে চাইলেন। প্লেনটা শেষদিকে সামান্য লাফিয়ে উঠেছিল। এই হাওয়ায় যেটা স্বাভাবিক নয়। স্টিকটা আরও ধীরে টানতে পারত দাশগুপ্ত। তবু সে বলল, ইয়েস ম্যাডাম—ভেরি ফাইন ল্যাণ্ডিং!

—অবশ্য তোমার ল্যাণ্ডিং আরও পারফেক্ট। ডেভিড তো বলে, তোমাদের দলের মধ্যে, য়ু আর দ্য বেস্ট ফ্লায়ার। এয়ার ফোর্সে গিয়ে তুমি নিশ্চয়ই খুব শাইন করবে, সানিথ।

এয়ারফোর্স! তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে সেই আশ্চর্য একসাইটিং কেরিয়ার!

সুনীথের শরীরের মধ্যে যেন একটা ঝাঁকুনি দেয় কথাটা। কয়েক-দিনের মধ্যেই তারা এয়ারফোর্সের ইণ্টারভিউতে যাবে। ক্লাবের অধিকাংশ ছেলেই কমারশিয়াল পাইলট হবার ট্রেনিং নেয়। কিন্তু তাদের দলটাকে সোলো ফ্লাইং শেষ হবার পর এবার যেতে হবে এয়ারফোর্সে। এয়ারফোর্স ইনস্ট্রাকটার ডেভিড এজন্যেই তাদের বিশেষভাবে ট্রেনিং দিয়েছেন।

আসন্ন ইণ্টারভিউয়ের কথা ভেবে উত্তেজনায় বুক ভরে ওঠে সুনীথের। মুগ্ধ চোখে রিখির দিকে তাকিয়ে বলে—থ্যাঙ্ক য়ু ম্যাডাম, থ্যাঙ্ক য়ু ভেরি মাচ।

রিখির টলটলে চোখের মধ্যে শিশির-ভেজা মাঠের ছায়া! দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে ফুলের মতো কোন প্রসাধনের গন্ধ!

মাঠের আর একদিকে দাঁড়িয়ে ইনস্ট্রাকটার মিঃ চৌধুরী আর জয়ন্ত।

ওদের সামনে রুপোলী রঙের টাইগার মথ জি কে জেড। ছটুলাল জিকের ট্যাঙ্কে তেল ভরছে। জয়ন্ত নতুন ছেলে, তাকে কক্‌পিট ড্রিল শেখাচ্ছেন চৌধুরী।

—তাহলে, প্রথমে হল এইচ—হারনেস, মানে বেল্টগুলোকে শক্ত করে বাঁধুন। দেন টি—অর্থাৎ আপনার ট্রিমার, থ্রটল, সব পর পর চেক করুন, তারপর ফিউয়েল.........।

মিঃ চৌধুরীর এক হাতে হেলমেট, আর হাতে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে প্রকান্ড গোঁফ জোড়া পাকিয়ে চলেছেন। ছটুলাল ডাইনে বাঁয়ে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে সমানে পেট্রল পাম্প করে চলেছে। সকালের রোদ্দুরে জিকের ডানাগুলো চিকচিক করে কাঁপে।

রিখি সেদিকে খানিকক্ষণ দেখতে দেখতে বলে উঠলেন—দুটো টাইগার মথের মধ্যে তোমার কোন্‌টাকে বেশি পছন্দ, সানিথ? জিকে না ডিয়ার?

—আই লাইক ডিয়ার, শী ইজ মাই ফেভারিট মেশিন।

—নামের জন্যেই খুব পছন্দ হয়—না?

রিখির মুখে মৃদু কৌতুক। রোদ্দুরের আভায় গোলাপী মুখটা আরও সুন্দর লাগছে দেখতে। তাঁর প্রসাধনের ঘ্রাণের সঙ্গে ফিউয়েলের গন্ধ মিশে কেমন অদ্ভুত লাগছে এখন।

সুনীথ হাসল—না, তা ঠিক নয়; অ্যাভিয়েশান পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দুটোই হয়ত সমান। কিন্তু আমি ডিয়ার নিয়েই বেশির ভাগ ফ্লাই করেছি. কক্‌পিটটা বড় চেনা, তাই—

বাঁ দিকে ডানা ঝুলিয়ে টার্ন নিচ্ছে দাশগুপ্ত। প্রবল হাওয়ার ঝাপটায় প্লেনের আওয়াজটা চিরে যায়। সেদিকে দেখতে দেখতে সুনীথ বলে—স্কোয়ান লীডার ডেভিডের কিন্তু ভীষণ পছন্দ মেশিনটা, ডিয়ার ছাড়া তো তিনি উড়তেই চান না। মাঝে মাঝে ডিয়ারের গায়ে চুমুও খেতে দেখেছি তাঁকে।

—ডেভিড একটা পাগল, সবতাতেই ওর বাড়াবাড়ি। কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকিয়ে হাসলেন রিখি।

রানওয়ের এক প্রান্তে চীফ ইনস্‌ট্রাকটার মিঃ ব্যানার্জী টেক অফ করছেন এবার। এল ফাইভ নিয়ে ক্রস কান্ট্রি নেভিগেশান যাচ্ছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কমারশিয়াল পাইলট সলিল দাশ। তাঁরা উড়তেই এয়ারফোর্সের দুখানা ডাকোটা লোকাল ফ্লাইং শুরু করল। গোটা আকাশটা বিভিন্ন এয়ারক্র্যাফটের তীব্র গর্জনে মুখর হয়ে উঠছে ক্রমশ। তার মধ্যে ডিয়ারের গোঁ গোঁ আওয়াজ

একটানা সমানে বেজে যায়।

রিখির চোখ দুটো এখন আকাশের দিকে। কেমন এক উদাসীন অন্যমনস্ক দৃষ্টি। গম্ভীর হলে তাঁর মুখটা একটু বেশি ভারি লাগে। একটু যেন বিষণ্ন বিষণ্ন ভাব। তুলনায় স্কোয়ান লীডার একেবারে ভিন্ন স্বভাবের মানুষ। সব সময় হইচই বা যা হোক একটা কিছু নিয়ে মেতে আছেনই। কক্‌পিটের মধ্যেও তাঁকে গম্ভীর হতে দেখা যায় না। কন্ট্রোলে হাত ছোঁয়ালে হালকা মেশিনগুলোও যেন তাঁর মেজাজ পেয়ে যায়। ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও তখন পাখির মতো এঁকেবেঁকে দোল খেয়ে, মেশিনটা আকাশময় দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করে।

প্রথম আলাপের দিনেই অবশ্য তাঁর এই মেজাজের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলায় ক্লাবে বসে ড্রিংক করছিলেন। লম্বা চওড়া চেহারার ওপর মাজা কালো রঙ। সদ্য পাট ভাঙা সাদা পোশাক। কালো নকশা কাটা জাপানী টাই।

কেউ পরিচয় করিয়ে দেবার আগে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন—গুড ইভনিং. মাই ইয়াং ফ্রেন্ডস, আমি সেই স্কোয়ান লীডার ডেভিড, বয়স ছত্রিশ, বিবাহিত. নিঃসন্তান। বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে দিলেন সবার দিকে। মুখে একগাল সরল হাসি, একেবারে দিলদরিয়া মেজাজ। মিসেস ডেভিড চুপচাপ পাশে বসে-ছিলেন। হঠাৎ তাঁকেও টেনে তুললেন।

—এবং এই সুন্দরী মহিলা হলেন রিখি, আমার প্রথম স্ত্রী। আর আমার দ্বিতীয় জন, ক্যান য়ু অল গেস, হু ইজ শী? আন্দাজ করতে পার—কে?

সবাই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকায়।

—ওয়েল, ইট ইজ মাই এয়ারক্র্যাফট। বলেই হা হা করে প্রচণ্ড হাসিতে ঘর কাঁপিয়ে তুললেন।

ডেভিডের কথায় কেউ না হেসে পারে না। মুহূর্তের মধ্যে সবার সঙ্গে একেবারে আন্তরিক সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললেন তিনি। নানা বিষয়ে উৎসাহ। অনর্গল কথা বলতে পারেন। কথা বলার সময় হাত মুখ চোখ সমানে ঘুরতে থাকে। ইংরেজি আর উর্দু দুটোই তাঁর নিজস্ব ভাষা। বাংলা জানেন সামান্য। বলতে গেলে অবশ্য বেপরোয়া ইংরেজি, হিন্দী, উর্দু মিশিয়ে নেন। রিখিকে দেখিয়ে বলেন, মাই ওয়াইফ কিন্তু হাফ বাঙালী। ফাইন বাংলা বলতে পারে।

রিখি এলাহাবাদের মেয়ে। তাঁর ঠাকুমা ছিলেন নাকি বাঙালী ক্রিশ্চান।

বরাবর কনভেণ্টে পড়াশুনো করলেও ঠাকুরমার প্রভাবটা তাঁর ওপর রয়ে গেছে। কাজ চালাবার মতো বাংলা ভালই জানেন।

রিখি অবশ্য সেদিন দু-একটার বেশি কথা বললেন না। সারাক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। মাঝে মাঝে ডেভিডের বেফাঁস ঠাট্টায় মুখটা লাল হয়ে উঠছিল। ফরসা গোলাপী রঙ, টলটলে কালো চোখ, টানা নাক—সব মিলিয়ে অপূর্ব কমনীয় চেহারা। বাড়ন্ত শরীরের তুলনায় মুখটা যেন অনেক কচি। তার সঙ্গে মানিয়ে পরেছেন সবুজ ছিটের ফ্রক। দু' কানে বড় বড় দুটো রিঙ। ডেভিডের পাশে অনেক ছোট মনে হয় তাকে। স্কোয়ান লীডার নিজেও সে বিষয়ে সচেতন। বারবার "মাই ইয়াং ওয়াইফ" বলে তাঁর পরিচয় দিয়ে সেটা আরও স্পষ্ট করে তোলেন।

কয়েকদিন বাদেই অবশ্য বোঝা গিয়েছিল চুপচাপ থাকলেও রিখি ঠিক পুতুল সেজে বসে থাকার মেয়ে নন। নাচ, গান, গেমস, ফ্লাইং সব বিষয়েই তাঁর সমান উৎসাহ। টেবল টেনিসে পাকা হাত। তাঁর কাছেই প্রথম টেবল টেনিসে হাতেখড়ি সুনীথের। পরে যেদিন প্রথম তাঁকে হারাতে পেরেছিল, রিখি সেদিন হেসে বললেন, টু ডে আই'ম রিয়েলি গ্ল্যাড সানিথ—তোমাকে খেলা শেখানো আজ সার্থক হল আমার। কিন্তু ফ্লাইং জানেন না বলে ভীষণ আফসোস রিখির। ক্লাবে এসে সেটা শিখবেন বলে একবার রীতিমত উদ্যোগও করলেন। কিন্তু সব ভেস্তে গেল শেষ পর্যন্ত। ডেভিডই বাধা দিলেন। তাঁর সেই এক বাঁধা ঠাট্টা মুখে—ওয়েল, আমি আমার দুজন বউকেই এক সঙ্গে আকাশে ভাসাতে পারি না।

কিন্তু আকাশে ওড়া থেকে সত্যিই নিরস্ত করা যায় না রিখিকে। সুযোগ পেলেই কারো না কারো সঙ্গে আকাশে উঠে পড়েন। সোলো পাবার পর সুনীথকে বলে রেখেছেন, প্যাসেঞ্জার নিয়ে ওড়বার অনুমতি পেলেই প্রথম তাঁকে নিয়ে উড়তে হবে।

পর পর ভারি কয়েকটা প্লেনের জন্যে এতক্ষণ সারকিট ছেড়ে দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল ডিয়ার। আবার তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উত্তর দিক থেকে গ্লাইড করে সোজা নিচেয় নেমে আসছে। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে কয়েকটা লাল নীল আগুনের বল ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। কণ্ট্রোল টাওয়ার পাইরোটেকনিক ফায়ার করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ওদের। রানওয়ে নিরাপদ নয়। এ প্রান্তে টেক অফ করার জন্যে গুড়ি গুড়ি এগিয়ে আসছে

দু'খানা ফাইটার। নামতে আসা ডিয়ারের উদ্দেশ্যে সেই সংকেত জানাচ্ছে আলোগুলো! সাবধান, সামনে বিপদ! বী অ্যালার্ট! মুখ ঘুরিয়ে নাও তোমাদের—এখনো সতর্ক হও।

—কী হল সানিথ?

পাইরোটেকনিক আলো দেখে চমকে ওঠেন রিখি। সুনীথ আঙুল তুলে ফাইটার দুখানার দিকে দেখায়।

আরও নিচেয় চলে এল ডিয়ার। রানওয়ের দিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখেনি দাশগুপ্ত। অনেক আগেই ওর ইঞ্জিন খুলে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। দেখতে দেখতে আরও দুটো রঙিন গোলা ছুঁড়ল কণ্ট্রোল-টাওয়ার।

রিখি যেন বেশ ঘাবড়ে যান এবার—গুড গড। কী করছে ওরা এখনো?

হঠাৎ সুনীথের একটা হাত চেপে ধরেন তিনি। একটু যেন কাঁপছে হাত দুটো।

সুনীথ চমকে গিয়ে হেসে ফেলে—আপনি কি সত্যিই ভয় পাচ্ছেন? স্কোয়ান লীডার ডেভিড তো রয়েছেন কক্‌পিটে, তাঁর কাছে এটা অত্যন্ত সামান্য ব্যাপার। দেখবেন, ঠিক উঠে যাবেন সময়মত। মনে হয়, দাশগুপ্তকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে দেখছেন, ও কী করে এই অবস্থায়।

সুনীথের কথা শেষ হবার আগেই গর্জন করে ওঠে ডিয়ারের ইঞ্জিন। মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে তীরের মতো ওপরে উঠে গেল প্লেনটা। এইবার নিশ্চয়ই ডেভিডের হাত পড়েছে কণ্ট্রোলে।

—দেখলেন তো! রিখির দিকে তাকিয়ে হাসল সুনীথ—এই হলেন স্কোয়ান লীডার ডেভিড—এ রিয়েল মাস্টার। ওঁর মতো পাইলটের কাছে ফ্লাইং শেখা, সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার!

দু' ঠোঁটে হাওয়া টেনে একটা চুক চুক শব্দ করে বললেন রিখি—ইস্‌, এমন সুন্দর কমপ্লিমেণ্টটা শুনতে পেল না তোমাদের ইনস্‌ট্রাক্‌টার। বেচারা! আচ্ছা, আমিই ওর হয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি—থ্যাঙ্ক য়ু সানিথ, থ্যাঙ্ক য়ু ভেরি মাচ।

বলতে বলতে রিখি রহস্য করে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিলেন সামনে। তাঁর সুগঠিত দেহটা অপূর্ব ঢেউয়ের মতো দুলে আবার সোজা হয়ে যায়। ভীষণ স্মার্ট লাগে দেখতে। দেহ প্রসাধনের সেই পরিচিত গন্ধটা এক ঝলক হাওয়ার মতো মুখে ঝাপটা দেয় এসে। সুনীথ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রানওয়ের দিকে তাকায়।

আকাশ-ফাটা আওয়াজ ওদিকে। চারদিক কাঁপছে থরথর করে। হোগল;

আর উলুখড়ের জঙ্গলে ঝড়। ফাইটার প্লেন দুটো টেক-অফ করছে। পিছনের জঙ্গলে ঝড় তুলে প্রথমটা দৌড় শুরু করল। সামান্য বিরতির পর দ্বিতীয়টা। আকাশে উঠে একটা পাক খেয়ে ওরা পশ্চিম দিগন্তের দিকে মিলিয়ে গেল। যতদূর দৃষ্টি যায় সুনীথ মুগ্ধ চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ক্যান্টিনের বাইরে ঘাসের ওপর চেয়ার টেবল পাততে শুরু করেছে মাসুদ। সকালের ফ্লাইং শেষ করে অনেকে ওখানে বসেই চা ব্রেকফাস্টের অর্ডার করবে।

রিখি বললেন—চল সানিথ, এক কাপ চা খাওয়া যাক। ডেভিডের আজ দেরি হবে মনে হচ্ছে।

সুনীথ নিঃশব্দে অনুসরণ করে তাঁকে।

মাসুদ বড় এক পট চা রেখে গেল সামনে। সঙ্গে পেস্ট্রি, চীজ। রিখি চা তৈরি করে একটা কাপ এগিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর হাত থেকে কাপটা নিয়ে এবার একটা সিগারেট ধরাল সুনীথ।

চায়ে চুমুক দিয়ে রিখি বললেন—সানিথ, তুমি যে এয়ারফোর্সে জয়েন করতে যাচ্ছ, তোমার বাড়ির সবার মত নিয়েছ তো এর জন্যে?

প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সুনীথ। তারপর আস্তে আস্তে বলে—বাড়ি বলতে আমি, আমার বোন সুধা, মা আর কাকা। কাকার কোন অমত নেই, সুধার তো বেশ পছন্দই এই জীবন—একমাত্র আমার মা, তাঁকে ঠিক বোঝানো যাচ্ছে না ব্যাপারটা।

—তবে? তুমি এখন কী বলবে তাঁকে?

—মনে হয়, শেষ পর্যন্ত তিনিও রাজী হয়ে যাবেন। আর না হলেও আমাকে যেতে হবে। আমি নিরুপায়।

—আই সী, একটা ভারি নিশ্বাস ফেললেন রিখি। তারপর কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করলেন—তোমরা কবে রওনা হচ্ছ দেরাদুন?

—দশ তারিখ, ইন্টারভিউয়ের আগের দিন ওখানে পৌঁছোতে চাই আমরা।

—তবে তো দিন এসে গেল। এখন তোমার কী রকম মনে হচ্ছে সানিথ?

—ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। খালি মনে হচ্ছে, কবে অ্যাকাডেমি থেকে বেরিয়ে একটা সুপারসনিক ফাইটারের কক্‌পিটে বসতে পারব। বলতে বলতে হেসে ফেলল সে।

রিখিও হাসলেন তার কথায়—দ্যাটস ফাইন! সারাক্ষণ তুমি বোধ হয়

এয়ারফোর্স আর এয়ারক্র্যাফট ছাড়া আর কিছুই ভাবো না, তাই না সানিথ?

—দিস ইজ মাই ওনলি অ্যাম্বিশান ম্যাডাম। ছেলেবেলায় এক সময় খুব রুগ্ন ছিলাম, কোনদিন কোন সাহসের কাজ করতে পারিনি। সবাই কেমন কৃপার দৃষ্টিতে দেখত আমায়, খুব খারাপ লাগত। মনে মনে দুঃসাহসিক একটা কিছু করবার কল্পনায় উত্তেজিত হয়ে পড়তাম। এয়ারফোর্সের একজন ফাইটার পাইলটের কথা মনে হত তখন। রকেট নিয়ে যে ঝড়ের মতো তার টার্গেটের দিকে ছুটে চলেছে। ভীষণভাবে সেই জীবনটা আকর্ষণ করত আমায়। তারপর একদিন যখন সত্যিই আকাশে উঠলাম, কণ্ট্রোল স্টিকটা পেলাম হাতের মুঠোয়, আমার যেন নেশা ধরে গেল। মনে হল, আমি যেন এরই অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন। দেখলাম এ এক অদ্ভুত জগৎ। যেখানে এলে এতদিনকার চেনা মানুষজন পথঘাট ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে আমি কোথায় কতদূর চলে যেতে পারি। আবার ইচ্ছে করলে, মুহূর্তের মধ্যে সবার চোখের সামনে এই মেশিনটা নিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে একটা ভয়ংকর রকমের দুঃসাহসিক অ্যাকসিডেণ্টও ঘটাতে পারি। আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে সব আমার হাতের মুঠোয়—ওঃ, দ্যাট ওয়জ এ রিয়েল সেনসেশান। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় আমার বুকটা যেন হাওয়া-ভরা উইণ্ড সকসের মতো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। তারপর যত দিন গেছে সেই নেশাটা যেন আরও তীব্রভাবে চেপে ধরেছে আমায়। সত্যি বলতে কি, এখন আমার কাছে এর চেয়ে বড় আর কিছু নেই।

একটানা আবেগে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সুনীথ। রিখির দৃষ্টি বিস্ফারিত। অবাক হয়ে সুনীথের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন তিনি—আশ্চর্য! তুমি মনে মনে এত কল্পনা কর ফ্লাইং নিয়ে!

সুনীথ লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। রিখি হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর তার হাতে একটা মৃদু চাপ দিয়ে বলতে লাগলেন—ভেরি গুড সানিথ, তুমি সত্যিই এয়ারফোর্সের পক্ষে আদর্শ ছেলে! টিপিক্যাল এয়ার-মাইণ্ডেড বয়। এর আগে ডেভিডের অনেক ছাত্রকে দেখেছি আমি, কিন্তু তোমার মতো একজনও নয়—সব সময় এই ব্যাপার নিয়ে এরকম স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থাকতে কাউকে আমি দেখিনি। নিশ্চয়ই তুমি একদিন খুব বড় পাইলট হবে সানিথ—এবং আমরা সবাই তাই চাই।

রিখির গলায় গাঢ় সহানুভূতির স্বর। দু' হাতের নরম তালুতে কোমল আন্তরিকতার উত্তাপ। সুনীথের সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে থাকে। অভিভূত হয়ে সে বারবার ধন্যবাদ জানায় রিখিকে।

আরও খানিকক্ষণ তারা বসে রইল মাঠের মধ্যে। মাথার ওপর নানা ধরনের এয়ারক্র্যাফটের বিচিত্র গর্জন। এলোমেলো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ। তার মধ্যেও খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে আরও অনেক কথা বলে চললেন রিখি: আকাশে উড়ে বেড়ানো মানুষদের সমস্যা, তাদের খেয়াল খুশি, চরিত্রের কথা। বন্ধুর মতো উপদেশও দিলেন অনেক। হাত বাড়িয়ে আর একবার আবেগের সঙ্গে শুভকামনা জানালেন তার আসন্ন ইণ্টারভিউয়ের কথা তুলে। তারপর এক সময়—'সী য়ু এগেন,' বলে অফিস ঘরের দিকে উঠে গেলেন।

অফিস ঘরের বারান্দায় তখন মিসেস মৈত্র আর ক্যাপটেন মৈত্র এসে বসেছেন। মিসেস মৈত্র অনেকক্ষণ থেকেই হাতের ইশারায় রিখির দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন।

স্কোয়ান লীডার ডেভিড তখনো আকাশে। মাঝে একবার নিচেয় নেমে দাশগুপ্তকে ছেড়ে আর একজনকে নিয়ে উপরে উঠে গেছেন। মাঝখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি নামলেন না কক্‌পিট থেকে। সেখানে বসেই নতুন ব্যাচের একটা ছেলেকে পিছনে বসিয়ে আবার টেক-অফ করলেন। বোধ হয় পুরো সকালটাই একটানা ফ্লাইং করতে চান আজ।

সারকিট ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে ডিয়ার। আওয়াজটা ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশ। সুনীথ সেদিকে তাকিয়ে বসে বসে ডেভিডের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে কয়েকটি চেনা গলা আর হাসির হুল্লোড় শোনা যায়। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল সুনীথ। সিকিউরিটির ছাউনি ছাড়িয়ে বড় মাঠের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে তাদের পুরো দলটা। দেরাদুন যাবার আগে ওরাও আজ ডেভিডের সঙ্গে দেখা করতে আসছে। পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে হাসিঠাট্টা গল্পগুজবে মত্ত ওরা এঁকেবেঁকে যেন টগবগিয়ে পথ হাঁটছে। হাসছে হো-হো করে. চিৎকার করছে থেকে থেকে। উৎফুল্ল খুশিতে আবেগে ঝকঝকে সব ক'টা মুখ।

সবার আগে সমর। সবচেয়ে লম্বা, রোগা শরীর। চোখে ঘুম ঘুম ভাব, হরদম সিগারেট খায়।

তার পিছনে পিনু। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, মুখটা গোল, রোদে পোড়া রঙ, আদুরে ছেলের মতো হাসে।

পিনুর পাশে গুপ্ত। কালো ছিপছিপে শরীর, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে—মোটা মোটা চোখ, সহজে রেগে যায়।

সবশেষে দি গ্রেট হারীত—পিনুর ভাষায় এখনো আণ্ডারএজ। টকটকে ফরসা, সামান্য উঁচু দাঁত, ছেলেমানুষের মতো রসিকতা করে। গুপ্তর পিছনে লেগেই আছে সব সময়।

মাঠ ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠতেই এক ঝাঁক ফাইটারের ফর্মেশান ওদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। হারীত সেদিকে তাকিয়ে হাত দুটোকে ডানার মতো তুলে গুপ্তর দিকে উড়ে আসে। তারপর একটা ডাইভ দেবার ভঙ্গিতে সোজা গুপ্তর পেটে গুঁতো মারে। আচমকা ধাক্কা খেয়ে তার দিকে তেড়ে যায় গুপ্ত। কিন্তু কোথায় হারীত! শেয়ালের চেয়েও দ্রুত ছোটে সে।

সমর একটা সিগারেট ধরিয়ে দূর থেকেই প্যাকেটটা রবারের রিঙ-এর মতো ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচাল—সুনীথ, ধর।

ডান দিকে হাত বাড়িয়ে সুনীথ খপ করে লুফে নেয় প্যাকেটটা। এবার দেশলাইটাও ছোঁড়ে সমর সোজা তার কপাল টিপ করে। সুনীথ সেটাও খুব সহজে ধরে নেয়।

সমর হাততালি দিল—সাবাস গুরু, এয়ারফোর্স টিমে তোমার চান্স বাঁধা।

হাসতে হাসতে ওদের পুরো দলটা এবার ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল এসে। মাঠের মধ্যে চেয়ার টেনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোল হয়ে বসল সবাই। সমর হাঁকল—মকবুল, চায় ভেজো জলদি—এক, দো, তিন, চার, পাঁচ কাপ।

মকবুল সমরের গলা পেয়ে মাঠের মধ্যে নেমে আসে। তার দিকে একটা সিগারেট ছুঁড়ল সমর। তারপর আড়চোখে পিনুকে দেখিয়ে বলল—অর দেখো, যিতনা বিল হোগা আজ, সব ইয়ে বড়া সাহাবসে লে লেনা। ঠিক হ্যায়? মকবুল হাসিমুখে সেলাম দেয়—জী সাব। এদের ধরনধারন মকবুলের সব জানা।

হারীত কপালে হাত ঠেকিয়ে পিনুর সামনে মাথা নোয়ায়—সেলাম বড়া সাহাব। গুপ্ত ফিক ফিক করে হেসে যায় সমানে।

দুই

সিলেকশান বোর্ডের সদর দপ্তর শহরের এক প্রান্তে।

ওরা যখন সেখানে পৌঁছোলো তখন সবে সকাল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। প্রকাণ্ড য়ুক্যালিপটাস গাছগুলোর পাতায় ঝিরঝির করা ঝিঁঝিঁ শব্দ। সকালের স্নিগ্ধ হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস টানল সুনীথ। ডেভিডের উপদেশ মনে পড়ল, সব কিছু সহজভাবে নেবে, কোন কারণেই উত্তেজনা প্রকাশ করবে না, নার্ভাস হবে না—টেক ইট ইজি মাই বয়। ঠাণ্ডা মাথায় থাকলে, দেখবে সবকিছু কেমন সহজে পার হয়ে গেছ।

কথাটা মনে রেখেছে সুনীথ। নিজেকে তাই এখন একটু অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেটাই বোধ হয় সবচেয়ে কঠিন কাজ।

প্রায় দু-তিন দিন সমানে ট্রেনের ধকল গেছে। খাওয়াদাওয়া, ঘুমের অনেক অনিয়ম। অন্য সময় হলে কষ্টটা ঠিক অনুভব করতে পারত। কিন্তু এখন সেসব দিকে কোন খেয়াল নেই। সব কিছু ছাপিয়ে একটা তীব্র উত্তেজনার ঢেউ তার শিরা-উপশিরার মধ্যে বয়ে চলেছে। ফ্লাইং শেখার প্রথম পর্ব শেষ। এখন এই বোর্ডের মনোনয়ন পেলেই তারা সরাসরি এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে যোগ দিতে পারবে। বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, তারপর আর কোন বাধা নেই। আসন্ন এই ইণ্টারভিউয়ের জন্যে তাই সবার উদ্বেগ ও উত্তেজনা এখন ধনুকের ছিলার মতো টান টান হয়ে উঠছিল।

—জায়গাটা কিন্তু খুব নাইস! সুনীথের পাশে দাঁড়িয়ে গুপ্ত ফিস ফিস করে বলে। আপনা থেকেই ওর গলার স্বর নেমে গেছে।

পিনু ওর দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসল। গুপ্তর চোখ জ্বলজ্বল করে। সে ভীষণ সিরিয়াস এখন। গুপ্তকে আদর করে ওরা উইং কমানডার বলে। গুপ্ত মাঝে মাঝে বেশ চটে যায় ডাকটা শুনে। সমর এখন পরিবেশটা হালকা করার জন্যে ওকে একটু রাগাতে চাইল—উইংকো, আমাদের কেসটা একটু রেকমেণ্ড করে দিয়ে যেও—এখানে সবাই তো তোমার জুনিয়ার।

গুপ্ত চোখ দুটো আরও বড় করে হাসল—অফকোর্স! কোন চিন্তা নেই তোমাদের। আমি সব ম্যানেজ করে দেব।

এখন আর সহজে রাগতে চায় না গুপ্ত। হারীত একেবারে চুপ। পিনু অনেকবার খুঁচিয়েও তাকে কথা বলাতে পারছে না। দলের মধ্যে হারীতই এখানকার হাল হকিকত একটু জানে। এর আগে আর একবার সে এখানে ঘুরে গেছে।

সুনীথ ক্রমাগত কেবল সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। অনেক সিগারেট খাওয়া হয়েছে গত কয়েকদিন। গলা বুক জ্বালা করে। তবু টানতে লাগল। অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে চোখ খুলে চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিতে চায় সে।

এক দিকে প্রকাণ্ড একটা মাঠ, আর এক দিকে সার সার কতকগুলো অ্যাজবেসটাসের ব্যারাক। পাহাড় ঘেরা নির্জন এলাকা। ব্যারাকগুলোর মধ্যে ছোট ছোট বাঁধানো রাস্তা। রাস্তার দু' পাশে ফুলের গাছ। বোগেনভেলিয়া লতা। ছবির মতো সাজানো সব।

কোনদিকে কোন গোলমাল বা ব্যস্ততার চিহ্ন নেই। চাপা নিস্তব্ধতায় মোড়া পরিবেশ। শুধু কোথা থেকে একটা টাইপরাইটারের মৃদু খট্‌খট্‌ শব্দ। ওদের সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে ওয়ারেণ্ট অফিসারের য়ুনিফর্ম পরা একটি গম্ভীর চেহারার লোক বেরিয়ে আসে। এক জোড়া ভারি বুটের ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ। পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে লোকটি পর পর তাদের নাম ডাকা শুরু করল। পিনু একবার চুলটা আঁচড়ে নিতে যাচ্ছিল চুপি চুপি। হারীত কনুই দিয়ে ওকে ধাক্কা দেয়—এই পিনু, বী কেয়ারফুল।

লোকটা একে একে সবার নাম পড়ে যাচ্ছিল। প্রথমে তাদের দল, তারপর ওদিকে আরও কয়েকজন। সব প্রদেশ মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ জন ক্যানডিডেট। জুতোর গোড়ালিতে শব্দ তুলে একে একে সাড়া দেয় সবাই।

রাজস্থানের ভাণ্ডারী ঘাবড়ে গিয়ে গলা থেকে এক অদ্ভুত আওয়াজ বার করল। ঘাড়ে গর্দানে মেশানো গোল চেহারা। চর্বিতে থলথলে দেহ। একটা চাপা হাসি রিলে হয়ে লাইন ধরে ছড়িয়ে যায়।

নাম ডাকা শেষ হলে লোকটি একটা লম্বা ব্যারাকের মধ্যে ওদের পৌঁছে দিল। যাবার আগে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা করে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, ইণ্টারভিউয়ের ক'দিন সবাইকে এখানে এক সঙ্গে থাকতে হবে। এবং নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী যখন যেমন নির্দেশ আসবে, সেইমত বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে চলবে তাদের টেস্ট আর ইণ্টারভিউ। তারপর লোকটি সবাইকে তার শুভেচ্ছা জানিয়ে আগের মতো গম্ভীর মুখে গট গট করে বেরিয়ে গেল।

সারি সারি পর্দা ঝোলানো লম্বা মতো একটা ঘর। জানলার কাছে নেয়ারের খাট, তার পাশে টেবিল চেয়ার, আলমারি। সুনীথ ভাল করে তাকিয়ে দেখল

তার নতুন আস্তানা। একটা সাজানো গোছানো সুন্দর হস্টেলের মতো ব্যবস্থা। বড় বেশি ফিটফাট সব কিছু। একটু এলোমেলো থাকলে বরং এর চেয়ে ভাল হত। এই পরিবেশটাই যেন মুখিয়ে আছে তাদের দিকে।

তার একদিকে হারীত, আর একদিকে সমর। সবাই বেশ-পরিবর্তন করছে দ্রুত। প্রথমবার ইণ্টারভিউ খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্যে হারীত এবার গোড়া থেকেই খুব সতর্ক। সবার কাছে জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবার জন্যে একজন করে বেয়ারা। তাদের মুখেও কোন কথা নেই। হারীত তার লোকটিকে বেশ সমীহ করে কী যেন বলছে। সমর গুন গুন করে একটা চালু হিন্দী গানের সুর ভাঁজে। নাচের ভঙ্গিতে শরীরটা একটু দোলায়।

কিন্তু ঘরের মধ্যে একসঙ্গে এতগুলো মানুষ চলছে ফিরছে তবু যেন পরিবেশটার খুব একটা বদল হয় না। ভেতরে কোথাও কাঁটার মতো একটা চাপা অস্বস্তি লেগেই থাকে। তার কাজ করার লোকটির মুখের দিকে দেখল সুনীথ। অত্যন্ত নিরীহ চেহারার বৃদ্ধ একজন। ঘরের মধ্যে এই লোকটিই সম্ভবত সবচেয়ে বয়স্ক। নাম জিজ্ঞাসা করতেই বলল—মেরা নাম সুরিন্দার, সাব। বিছানাটা পেতে এখন ড্রয়ারে সাবান, পেস্ট, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম পর পর গুছিয়ে রাখছে সুরিন্দার। কোন নির্দেশের অপেক্ষা না রেখে একটা স্বয়ংক্রিয় ডামির মতো কাজ করে যায় সে।

একটু পরে তার বুকে পিঠে ইংরেজি তিন সংখ্যা লেখা দু' খণ্ড কাপড়ের টুকরো বেঁধে দিল সুরিন্দার। সামনে পিছনে এখন তার একটাই পরিচয়। সবার শরীরেই এমনি একটা করে নম্বর বাঁধা শুরু হয়ে গেছে। পিনু এক, সমর দুই, সে তিন। তাদের নতুন নাম।

নম্বরটা বেঁধে পিনু বেশ স্মার্ট হবার চেষ্টা করে—এই সমর, এক নম্বরটা লাকী নাম্বার না?

সমরের মুখে সম্মতি অসম্মতি মেশানো এক বোবা হাসি। সেই অবস্থায় সে সুনীথের দিকে ফিরে চোখ টিপল। সুনীথ হাসতে হাসতে একবার তার সংখ্যাটির কথাও ভাবে।

নম্বর বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে যেন এক নতুন উত্তেজনা শুরু হয়ে গেছে মনের মধ্যে। যেন এখনি একটা রেস শুরু হতে চলছে। সংখ্যাটা বুকে নিয়ে তাদের এক বিরাট দৌড় প্রতিযোগিতায় নামতে হবে এবার। মাঠের বাইরে কোথাও বসে আছে বিচারকের দল। তাদের সামনে নিশানা লক্ষ করে ছুটছে এক, ছুটছে দুই, ছুটছে তিন......

তিন সংখ্যাটার কোন নির্দিষ্ট সংকেত আছে কি? কে জানে! চোখের

সামনে কালো সংখ্যাটা যেন নানা আকৃতিতে উল্টেপাল্টে ঘুরতে থাকে।

সবার প্রথমে তাদের যে টেস্টটা দিতে হয়েছিল, সেটা ছিল পাইলট হবার পক্ষে উপযুক্ত প্রবণতা বিচারের পরীক্ষা। বোর্ডের ভাষায় অ্যাপটিটিচিউড টেস্ট। নানা অবস্থায় উড়ন্ত অসংখ্য এরোপ্লেনের ডানার টুকরো টুকরো ছবি। ছবি দেখে ফ্লাইং-এর পরিভাষা অনুযায়ী কে কত দ্রুত তাদের সনাক্ত করতে পারে। তারপর বসতে হল একটা যন্ত্রের সামনে। সেটা চালু করতেই বুটি দেওয়া একটা কালো গোলক ঘুরতে থাকে। হাতের নিশান ঠিক রেখে একটা লোহার কাঁটাকে তার ওপর দিয়ে নির্দিষ্ট পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার পরীক্ষা। খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল দুটো ব্যাপার। তারপর ব্রেকফাস্টের বিরতি। ব্রেকফাস্টের পর আবার তাদের হাজির হতে হবে অন্য পরীক্ষকদের সামনে। ঠাসা প্রোগ্রাম দিনভর।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে সবাই তবু একটু সহজ হতে পারে। প্রথম চোটটা কাটিয়ে উঠে এবার অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠল তারা। ইণ্টারভিউয়ের প্রথম চেহারাটা খুব একটা খারাপ লাগেনি কারো। অন্তত যতটা ভয় পেয়েছিল তেমন কিছু নয়। খেতে খেতে এবার বেশ গল্পগুজব আর হালকা রসিকতায় মেতে উঠল সবাই।

দিল্লীর কুলকার্নি; ফরসা লম্বা চেহারা, বাঁকা তরবারির মতো গোঁফ, মাথায় কোঁকড়া চুল। বেশ উঁচু গলায় সগর্বে সে তার ফোর্স ল্যাণ্ডিং-এর অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছিল সবাইকে। এটা তার খুব একটা গর্বের ব্যাপার। সুযোগ পেলেই সে সবাইকে শোনাতে চায়। কবে তাদের প্লেনের ইঞ্জিনে গোলমাল দেখা দিতেই তারা এক মাঠের মধ্যে নেমেছিল।

গরুচরা মাঠ, দিনের আলোও তখন কমে এসেছে, সেই অবস্থায় সেই উঁচুনীচু মাঠের মধ্যে জীবন বিপন্ন ক'রে কী ভাবে তারা তাদের মেশিনটাকে নিখুঁতভাবে মাটিতে বসিয়ে দিল—সেই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা। মাটি ছুঁতেই নাকি প্লেনটা বিশ্রীভাবে লাফাতে লাগল। মনে হচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে বুঝি আণ্ডার ক্যারেজ ভেঙে পেটের মধ্যে ঢুকে পড়বে। শেষ পর্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে মাটির ওপর ঘষটাতে ঘষটাতে এক সময় থামল মেশিনটা। ওঃ গড!

কুলকার্নির মুখটা আত্মপ্রসাদে চকচক করছিল। যেন এখানকার সবার ওপর সে আগে থেকেই টেক্কা দিয়ে বসে আছে। নিজের সম্পর্কে খুব উঁচু

ধারণা তার।

ওদিকে আবার রাজস্থানের সেই গোলগাল চেহারার ভাণ্ডারীকে নিয়ে পড়েছিল সবাই। ইউ পি-র সাকসেনা বেশ মোলায়েম সুরে হুল ফোটাচ্ছিল তাকে—ভাইসাব, আমি বলছিলাম কি, খাওয়াদাওয়াটা এ ক'দিন একটু কমালে হত না? গতরের যা হাল তোমার, মেডিক্যাল টেস্টে কুছ গড়বড়ি হবে না তো?

সাকসেনার কথায় গলা ছেড়ে হাসতে লাগল সবাই। কিন্তু সাকসেনা হাসে না। মুখ কাঁচুমাচু করে একটা ভালমানুষী ভঙ্গিতে ভাণ্ডারীর দিকে তাকিয়ে থেকে সে খোঁচাটা আরও শানিয়ে তুলল। যেন এটা তার খুব একটা আন্তরিক দুশ্চিন্তার ব্যাপার। রাজস্থানী ছেলেরা মনে মনে চটলেও মুখে কিছু বলতে পারে না। ভাণ্ডারীর প্রকাণ্ড মুখটা রাগে অপমানে লাল হয়ে ওঠে। এমনিতে তার ওজন কিছু বেশি। এ নিয়ে সত্যিই তার ভয় আছে। সাকসেনা সেই দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছে।

সমর চায়ে চুমুক দিয়ে সুনীথের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরাল। গুপ্তর মুখে একটা চাপা হাসি। আড়চোখে সে তখনো ভাণ্ডারীকে দেখছে।

গুপ্তর সামনের দিকে কয়েকটা চুল বেশ সাদা। অল্প বয়সে চুল পাকা নাকি ওদের পারিবারিক রোগ। সমর ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বলল—উইংকো, তোমার চুলগুলোয় একটু কলপ লাগিয়ে নিলে পারতে, ওগুলো দেখলে কি এরা তোমার সার্টিফিকেটের বয়সটাকে বিশ্বাস করবে?

গুপ্ত রেগে গিয়ে বিড় বিড় করে—তোমার নিজের চরকায় তেল দাও, আমারটা ভাবতে হবে না।

সমর টেবিল চাপড়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়—কিন্তু তোমার চুলে একটু তেল মাখাতে পারলেই যে আমার ভাবনাটা যেত উইংকো।

গুপ্ত মুখ ফিরিয়ে বলে—নন্‌সেনস্‌।

তাদের দলের মধ্যে হারীতই একেবারে চুপচাপ। তার ধারণা এখানে তাদের সব সময় চোখে চোখে রাখা হয়। বুকে পিঠে তারই জন্য একটা করে নম্বর লাগিয়ে দেওয়া। বেফাঁস কোন কিছু দেখলেই নাকি রিপোর্ট হয়ে যাবে। হারীত তাই সব সময় খুব সতর্ক হয়ে আছে। দু-একবার তার কাছে অ্যাপটিচিউড টেস্টটা কেমন হল জানতে চেয়েও সুনীথ কোন জবাব পেল না। আসলে সুনীথের ইচ্ছে হচ্ছিল তাকেই কেউ এটা জিজ্ঞেস করুক। মন খুলে সে নিজের ভাল লাগার কথাটা শুনিয়ে দেবে সবাইকে। কেমন এক গভীর আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠছিল তার মন।

পিন্র বোধ হয় ভাল লাগেনি এটা। সে বলছিল—আমাদের এখন এই সব টেস্ট নেওয়ার কোন মানে হয় না। আমরা অলরেডি সোলো ফ্লাইং করে, লাইসেন্স নিয়ে তবে ইণ্টারভিউতে এসেছি—বল হারীত?

হারীত তেমনি নির্বিকার। দার্শনিকের মতো একবার মাথা নাড়ে শুধু।

পিনু অধৈর্য হয়ে এবার একটা খোঁচা মারে ওকে—এই, তুই তখন থেকে এমন গুম মেরে আছিস কেন রে, শালা! মন কেমন করছে? আসার আগে পাড়ার সেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝি?

গুপ্ত এতক্ষণে দাঁতের খিল খুলে হা হা করে হেসে ওঠে। সমর চোখে-মুখে একটা নাটকীয় ভঙ্গি করে হারীতের দিকে তাকায়।

পিনু হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করে বলল—উফ্, কী বলবো উইংকো, মেয়েটাকে তো দেখনি, দেখলে বুঝতে আমাদের হারীতচন্দ্র কী মেশিনের দিকে তাক করে আছে।

গুপ্ত সমানে ফিক ফিক করে হেসে যায়। মেয়েদের প্রসঙ্গ উঠলেই এটা তার বাঁধা স্বভাব।

ইণ্টারভিউ চলল প্রায় চার পাঁচ দিন ধরে। নানা রকম পরীক্ষা। কখনো মুখে, কখনো লিখে, কখনো যন্ত্রের সাহায্যে। দৈহিক যোগ্যতা, উপস্থিত বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাচাই করার ব্যবস্থা। কেমন এক নেশার মধ্যে সবগুলো পরীক্ষা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে যায় সুনীথ। কোথা থেকে কয়েকটা দিন কী দারুণ তর তর করে কেটে গেল। অথচ এ নিয়ে কত ভয় পেয়েছিল তারা। ভাণ্ডারীর মতো ছেলেও ফিজিক্যাল টেস্টের দিনে তার মোটা থলথলে শরীরটা নিয়ে এমন দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দিল যে সবার তাক লেগে গেল দেখে।

গুপ্তর অবশ্য একটু কাহিল অবস্থা হয়েছিল ডিবেটের দিনে। উত্তেজিত হয়ে পড়লে ওর কথা আটকে যায়। সুযোগ নিয়ে ওকে আরও রাগিয়ে দেয় সুনীথ। গুপ্ত চোখমুখ লাল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু রাগলেই বা কী করতে পারে সুনীথ। প্রতিপক্ষকে যে কোন উপায়ে ঘায়েল করার জন্যেই সে তখন মরীয়া।

কিন্তু সাইকোলজির পরীক্ষার দিন আবার তাকেও খুব নাজেহাল হতে হল। কী বিদঘুটে ধরন সে পরীক্ষার!

অন্ধকার ঘর। মাথার ওপর ঘুলঘুলির মতো একটা জানলা। পর্দার

আড়ালে বসে আছেন পরীক্ষক। মৃদু আলোর সামনে রাখা অর্ধনগ্ন একটি মেয়ের ছবি। শরীরের নিষিদ্ধ সীমানাগুলো প্রায় আবরণহীন। আড়াল থেকে একটি গভীর অথচ নিস্পৃহ গলা নির্দেশ দেয়—তোমার সামনে তুমি যে দৃশ্যটি দেখছ, তার সম্পর্কে তোমার যা মনে হয়, সংক্ষেপে তাই লিখে দাও। যেটা তোমার এই মুহূর্তের একান্ত ব্যক্তিগত কোন ভাবনা, ইচ্ছে করলে এটা নিয়ে একটা গল্পও বানাতে পার। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।

সুনীথ বিমূঢ় হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। কী লিখবে সে? নেপথ্য থেকে আবার সেই গম্ভীর কণ্ঠ—আশা করি, ছবিটা তুমি নিশ্চয়ই খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ।

—ইয়েস সার।

—তাহলে শুরু করো।

সুনীথ লিখতে শুরু করে : এই মুহূর্তে আমার সামনে একটি মেয়ের ছবি। খুব সুন্দর সুগঠিতা দেহের এক যুবতী নারী। এই মুখটা যেন আমার চেনা। কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছি এই মুহূর্তে তা আমি মনে করতে পারছি না। চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে, একটু আগেই হয়ত ও কাঁদছিল। অনেকক্ষণ কাঁদবার পরই মেয়েদের চোখ এরকম দেখতে হয়। হয়ত একটু আগেই দারুণ অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা ঘটে গেছে ওর জীবনে। সেই দুর্ঘটনার স্মৃতিই সম্ভবত এখন ওকে অন্যমনস্ক করে রেখেছে। এতটা অন্যমনস্ক যে এলোমেলো হয়ে যাওয়া জামাকাপড়ের দিকেও ওর কোন নজর নেই...।

তারপর আরও কয়েকটা ছবি। শেষে বিদঘুটে ধাঁধার মতো যত সব প্রশ্ন। যতটা সম্ভব চটপট উত্তর দিতে চায় সে। কিন্তু কোন্ উত্তরটা সবচেয়ে ভাল হল কিছুতেই বুঝতে পারে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অস্বস্তিকর এই পরীক্ষার হাত এড়িয়ে সে পালাতে চাইছিল। ডেভিড বলে দিয়েছিলেন—মোটেই ইতস্তত করবে না এই সময় উত্তর দিতে। আন্তরিকভাবে যা মনে হয় তাই বলে দেবে। ব্লাফ দিতে যেও না যেন। কিন্তু সব কথা কি খোলাখুলি বলা যায়?

তবু যতটা সম্ভব সরল এবং স্বাভাবিক উত্তরগুলোই দেবার চেষ্টা করছিল সে।

শেষ দিন সকালে ফলাফল ঘোষণা। সকল উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের অবসান হল অবশেষে।

অধীর হয়ে খবরটার জন্যে ওরা অপেক্ষা করছিল। নীল পাগড়ি বাঁধা সেই সুদর্শন শিখ অফিসারটি তখন ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঘরের

মধ্যে সবাই চুপ। সর্দারজীর হাতে টাইপ করা একখানা কাগজ। চোখেমুখে একটা উজ্জ্বল হাসি ফুটিয়ে সবাইকে প্রথমে অভিনন্দন জানালেন তিনি। তারপর সেই কাগজখানা থেকে একে একে পড়ে যেতে লাগলেন মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা। মোট তেত্রিশ জন নির্বাচিত। সুনীথের নাম সবচেয়ে প্রথমে।

প্রথমেই নিজের নাম শুনতে পেয়ে তার সারা শরীরটা যেন লাফিয়ে উঠল। একটা তীক্ষ্ন চিৎকারের মতো নামটা যেন কানের মধ্যে বাজতে থাকে। খানিকক্ষণ আর কিছুই শুনতে পায় না সুনীথ।

নামডাকার পর, যারা মনোনীত হল না তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলে চললেন সর্দারজী। উৎসাহব্যঞ্জক কিছু কথা। আগামীবার যাতে তারা আরও মনোবল, আরও সাহসের পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু সুনীথ আর কোনদিকেই মনোযোগ দিতে পারছিল না। তাদের মধ্যে থেকে গুপ্ত বাদ গেল। বেচারি উইংকো. তার নাম ডাকা হয়নি। এক কোণে মুখ নিচু করে চুপচাপ বসেছিল সে। খুব খারাপ লাগে সুনীথের তার জন্যে।

মাঝে শুধু একটা দিন. তারপরই মেডিক্যাল টেস্ট। যারা মনোনীত হল না তারা এখান থেকে ফিরে যাবে।

দুপুরের পর ওরা একে একে বিদায় নিতে লাগল। গুপ্তর চোখ দুটো লাল। যাবার সময় ও সবার হাত ধরে ঝাঁকাতে লাগল—গুড বাই অ্যান্ড গুড লাক। সুনীথকে জড়িয়ে ধরে বলল—কনগ্র্যাচুলেশানস সুনীথ, তুই আমাদের ইউনিটের মুখ রেখেছিস।

আসবার সময় সঙ্গে করে এক প্যাকেট স্ন্যাকস নিয়ে এসেছিল গুপ্ত। সমর অনেকবার চেষ্টা করেও এতদিন সেটা খোলাতে পারেনি। এখন সে নিজেই সেটা সুটকেস থেকে বার করে সমরকে দিয়ে বলল—এটা রেখে দে তোরা।

সমর বাধা দিতে গিয়েও পারল না। খুব করুণ লাগছিল গুপ্তর মুখটা। সেটা চাপা দেবার জন্যেই যেন সে শেষবারের মতো রসিকতা করে উঠল—দিস ইজ ফ্রম ইয়োর উইংকো মাই বয়. অ্যান্ড আই অর্ডার—এটা সবাইকে সমান ভাগ করে দেবে. আন্ডারস্ট্যানড্?

—ও কে. সার. তাই হবে। সমর অ্যাটেনশান হয়ে গুপ্তকে সামরিক ভঙ্গিতে স্যালুট করে।

একটা ম্লান হাসি ফুটে ওঠে গুপ্তর চোখেমুখে। সমর এবার দু হাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। দুজনের

আনন্দ আর দুঃখ পরস্পরের মধ্যে যেন ওরা ভাগাভাগি করে নিতে চায়।

মেডিক্যাল টেস্টের অভিজ্ঞতা তার কাছে কিছু নতুন নয়। ফ্লাইং শেখাব বিভিন্ন পর্বে অনেকবার সুনীথ এর মুখোমুখি হয়েছে। এবারেও সব কিছু আস্তে আস্তে চুকে আসছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোর্ডের তরুণ ডাক্তার ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুখার্জী তার শরীরের মধ্যে যেন অসাধারণ একটা কিছু আবিষ্কারের জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।

সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছিল তার। এতক্ষণ কোথাও কোন সন্দেহ হয়নি। সে জানে তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ওজন, দৃষ্টি সব স্বাভাবিক। প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট বা ক্লিনিক্যাল ডায়গনসিসেও কোন গোলমাল থাকবার কথা নয়। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেও কোন অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েনি। পারদভরা কাচের টিউবটাকে এক ফুঁয়ে উঁচুতে ধরে রেখে সে নির্ভুলভাবে তার ফুসফুসের শক্তিরও পরিচয় দিল। তবু ডাক্তার মুখার্জী তার বুক পরীক্ষা করতে করতে কপাল কুঁচকে উঠলেন।

বুকে পিঠে স্টেথোস্কোপ চেপে তিনি যেন কিছু একটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করেন। চোখেমুখে ক্রমশ একটা সন্দেহের ভাব ফুটে ওঠে তাঁর।

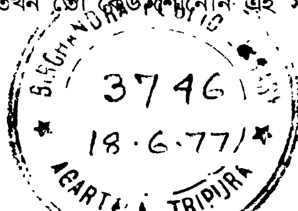
ভীষণ ভয় পেয়ে যায় সুনীথ। মরীয়া হয়ে সে প্রশ্ন করে—সার, এনিথিং রঙ দেয়ার?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার হার্টের কখনো কোন ট্রাবল হয়নি তো?

—নো সার, নেভার ইন মাই লাইফ—

—কিন্তু আপনার হার্টের মধ্যে যে অদ্ভুত একটা শব্দ পাচ্ছি—খুব মৃদু একটা মার্মারিং সাউণ্ড। শব্দটা মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে এক একবার। এটা তো থাকা উচিত নয় ভাই—

ডাক্তার মুখার্জী হঠাৎ একটু অন্তরঙ্গ হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন হয়ত। সমস্ত বুকের ভেতরটাই এবার ধড়াস ধড়াস করে কেঁপে উঠল সুনীথের। এই কাঁপুনিটাই কি মৃদু শব্দ হয়ে বুকের কোথাও জমে ছিল? স্টেথোস্কোপের নল বেয়ে সেই সূক্ষ্ম কম্পনটাই কি মুখার্জীর কানে পেঁাছেছে? এ ছাড়া আর কী হতে পারে? কয়েক মাস আগেও তো তার খুঁটিয়ে মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়েছিল। তখন তো কেউ শোনেনি এই সর্বনাশা মর্মরধ্বনি!



খুব কাতর ভঙ্গিতে সুনীথ বলে ওঠে—সার, আমার আগের রিপোর্ট-গুলো কিন্তু খুব ভাল, কোন কমপ্লেন নেই, আপনি ইচ্ছে করলে সেগুলো—

—ওয়েল, এখনো আপনার রিপোর্ট কিছু খারাপ নয়, শুধু এই শব্দটা কেমন যেন মনে হচ্ছে—অবশ্য এটা জাস্ট সন্দেহ আমার।

—কিন্তু আমি তো কিছু বোধ করছি না সার। ইন ফ্যাক্ট কোনদিন সামান্যতম কোন অসুবিধেও টের পাইনি এর জন্যে। এটা হয়ত সম্পূর্ণ নির্দোষ একটা শব্দ, প্লীজ ডক্টর, আমার সমস্ত কেরিয়ার নির্ভর করছে এর ওপর।

—আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন, আমার সন্দেহ তো ভুলও হতে পারে। আপনার কেসটা আমি আমাদের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর সাহানীর কাছে রেফার করছি।

ব্যাপারটা এইখানেই মিটিয়ে ফেলতে আর একবার তাকে অনুরোধ করল সুনীথ। কিন্তু ফল হল না। তাকে যেতেই হল ডক্টর সাহানীর কাছে।

বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট স্কোয়াড্রন লীডার সাহানী। রাশভারি গম্ভীর চেহারা। চওড়া লোমশ হাতে ইয়া বড় চুরুটের মতো এক একটা আঙুল। ভুরুতে অসম্ভব লম্বা লম্বা চুল। ঝুপসি হয়ে চোখের ওপর ঝুলছে। বুক থেকে স্টেথো তুলে নিয়ে তিনি কিছুক্ষণ সুনীথের মুখের দিকে দেখলেন। ভুরুর চুলের আড়ালে ক্ষুদে চোখ দুটো প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। চুল না সরালে তিনি আদৌ কিছু দেখতে পান কি না সন্দেহ। মুখের ওপর তার ভারি নিশ্বাসগুলোর ঝাপটা লাগে ক্রমাগত। যে কোন লোকেরই তাঁর সামনে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগবে। তবু দাঁতমুখ চেপে সব সহ্য করছিল সে।

সাহানী তাকে আর একবার তার পোশাকটা খুলে ফেলতে ইঙ্গিত করেন। জামা, গেঞ্জি খুলে সে চেয়ারের ওপর রাখল। তারপর প্যাণ্টের বোতাম খুলতে শুরু করতেই তিনি বাধা দিলেন—নো নো, লীভ ইট—।

ঘরটার মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা। খালি গা হতেই শীত শীত করে। কিন্তু সেই অবস্থায় শুয়ে থাকতে হল তাকে। সাহানী অনেকক্ষণ তার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইলেন। তাঁর বিরাট লোমশ শরীরটায় যেন কোন সাড় নেই। বসে বসে তিনি ঝিমোচ্ছেন কিনা তাও বোঝা যায় না। শাঁই শাঁই করা ভারি নিশ্বাসগুলো তেমনি সমানে বয়ে চলছে।

ক্রমশ একটা ভয়ের অনুভূতি সুনীথকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সাহানীর মতামতের ওপর এখন সব কিছু নির্ভর করছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তাকে সাহায্য করতে পারে না। তিনি 'হ্যাঁ' বললে হ্যাঁ, 'না' বললে সেইটেই শেষ কথা। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী কেউ আর সেটা ওল্টাতে পারবে না। নিজেকে সংযত করার হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও বুকের সেই কাঁপুনিটা থামাতে পারে না সে। সাহানীর আকৃতি এবং হাবভাবের মধ্যেই যেন ভীতিকর একটা ভঙ্গি। যেটা তাকে আরও দুর্বল করে ফেলছিল।

অবশেষে স্টেথোটা খুলে একসময় উঠে দাঁড়ালেন সাহানী। তারপর চুরুটের মতো একটা আঙুল কানের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন —ইয়েস, দেয়ার ইজ এ মার্মার।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভ্রূ দুটো লাফ মেরে ঝুপসি চুলগুলোকে একবার ঝাঁকিয়ে নিল। ভাবটা যেন, এই তো আমিও শুনেছি সেই দুর্লভ শব্দ। আমারও কান আছে। যদিও তাঁর অদৃশ্য চোখ এবং নির্বিকার মুখ থেকে কিছুই আন্দাজ করা যায় না, এ বিষয়ে তিনি কতটা নিশ্চিন্ত।

সুনীথ চেঁচিয়ে উঠতে যায়—নো, ডক্টর নো—এটা অসম্ভব। আপনি নিশ্চয়ই ভুল শুনেছেন। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফোটে না। একটা বোবা অনুভূতি মুহূর্তের জন্যে তার স্বরনালীকে অসাড় করে রাখে। অথচ সে টের পাচ্ছিল তার সমস্ত শরীর জুড়ে একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠছে। যাকে কিছুতেই সে এখন ব্যক্ত করতে পারে না। বুকের মধ্যে সমানে তোলপাড় করতে থাকে একটা মূক চিৎকার : নো, ডক্টর নো—এ হতে পারে না, কিছুতেই নয়। আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এই রকম অনিশ্চিত একটা অজুহাতে আপনি ভেঙে দিতে পারেন না। আমি ভালভাবেই জানি, আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক। এয়ারক্র্যাফটের কক্‌পিটে বসলে এখনো যে কোন ছেলের চেয়ে অনেক বেশি নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারি আমি...

সাহানী এবার তাঁর চেয়ারে বসেন। পোশাকটা ঠিকঠাক করে সুনীথ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এখনো যেন তার পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না ব্যাপারটা। মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা লেগে থাকে একটু। এর জন্যে নিশ্চয় একেবারে অমনোনীত হয়ে যাবে না সে। হয়ত তার অন্যান্য রিপোর্টগুলো দেখে সাহানী এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেবেন না।

কিন্তু ডক্টর সাহানী তার সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে দিলেন মুহূর্তে। অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন—ভেরি সরি মাই ফ্রেণ্ড, আমি তোমাকে এয়ারফোর্সের জন্যে রেকমেণ্ড করতে পারছি না। তোমার অন্যান্য সব ভাল,

কিন্তু হার্টের এই মার্মারটা আমাদের ভাল ঠেকছে না। শব্দটা সন্দেহজনক। হতে পারে, এটা তেমন মারাত্মক কিছুই নয়, তোমার হার্টের বিশেষ আকৃতিই এর জন্যে দায়ী। কিন্তু এয়ারফোর্স কোন ঝুঁকি নিতে পারে না। তোমার নিজের নিরাপত্তার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। য়ু বেটার লীভ ফ্লাইং; যদি আমার উপদেশ নাও তাহলে বলবো, ফ্লাইং ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন কেরিয়ার বেছে নাও তুমি। য়ু হ্যাভ এ ভেরি গুড রেকর্ড—যে কোন লাইনে গেলেই উন্নতি করতে পারবে তুমি—আমি নিশ্চিত এ বিষয়ে।

সাহানীর প্রত্যেকটি কথা যেন হাতুড়ির মতো আঘাত করে চলে তাকে। যেন কেউ থেঁতলে গুঁড়িয়ে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল তার ভেতরটা। সে যেন কাঠগড়ায় দাঁড়ানো এক খুনী আসামী, আর সাহানী তাঁর বিচারকের রায় পড়ে শোনাচ্ছেন। যে রায়ের বিরুদ্ধে দেশের কোন আদালতেই আর আপীল করা চলবে না। চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা দেখতে আরম্ভ করে সে। হঠাৎ সব কিছু যেন তার থেকে দূরে হটতে আরম্ভ করেছে। টলতে টলতে সে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

তার চোখের সামনে ভাসতে থাকা ঝাপসা গাছপালা, আকাশ সব কিছু যেন অনেক দূরে সরে যেতে লাগল এখন। তার এতদিনকার একমাত্র আকাঙ্ক্ষাও যেন এমনি করে মিলিয়ে যেতে থাকে। যে রোমাঞ্চকর জীবনের কল্পনায় সে এতকাল মাতাল হয়ে ছিল তা এই মুহূর্তে চিরকালের মতো তার নাগালের বাইরে চলে গেল। তার আর কিছুই করার রইল না।

অবসন্ন দেহমন নিয়ে অবশেষে সেইদিন রাত্রির ট্রেনে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হল সুনীথ। যাবার পথে সে একা। আসার সময় তারা দল বেঁধে আনন্দে উল্লাসে গোটা পথটা মাতামাতি করতে করতে এসেছিল। এখন সে নিঃসঙ্গ। গুপ্ত আগেই গেছে। এবার তার পালা।

তিন

বাড়ি ফেরার পর প্রথম কয়েকটা দিন কী দারুণ আচ্ছন্নতার মধ্যে কেটেছিল তার! উদ্দীপনাহীন, আকাঙ্ক্ষাহীন এক নিষ্প্রভ মানসিকতা। এয়ারফোর্সের সোনালী ঈগল এবার তার মুঠো থেকে বরাবরের জন্য উড়ে গেল। ঈগল আঁটা একটা ওভারঅল গায়ে চাপিয়ে সে কোনদিন আর কোন ঝোড়ো এয়ার-ক্র্যাফটের কক্‌পিটে বসতে পাবে না। হাল্‌কা কোন বিমান নিয়ে, ইচ্ছে করলে, হয়ত আবার উঠতে পারে আকাশে। কিন্তু কী লাভ তাতে? উড়ন্ত ইঞ্জিনের থরথরানি শরীরে শিহরন জাগিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাকে কোনদিন আর সেই ঈগলের স্বপ্ন দেখাবে না।

একটা বিমর্ষ মনমরা অনুভূতি সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকে মনের মধ্যে। পর পর ঘুম নেই কয়েকটা রাত।

মা এসে একদিন বোঝালেন—এতে তোর এত ভেঙে পড়বার কি আছে খোকা? জীবনে আর কি কিছু করা যায় না? ইচ্ছে হলে এখনো পড় না তুই, এম. এস-সিতে ভর্তি হয়ে যা। না হলে, অন্য কিছু কর। ঠাকুরপোর সঙ্গে ব্যবসাপত্তরের কাজও দেখতে পারিস একটু-আধটু।

সুনীথ চুপচাপ সব শোনে। মা'র মনোভাব তার অজানা নয়।

কাকা বরাবর কম কথার মানুষ। শুধু কাজের মধ্যে সারাজীবন নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। জীবনে বিয়ে করার অবকাশটুকু পর্যন্ত হয়নি তাঁর। সম্পূর্ণ একার চেষ্টাতেই তাঁর ব্যবসাটাকে দিনে দিনে বড় করে তুলেছেন তিনি। এর বাইরের কোন ব্যাপার নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাতে চান না। কিন্তু সুনীথের মুষড়ে পড়া ভাবটা তাঁকেও যেন বিচলিত করে। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—যা হয়ে গেছে তার জন্যে মন খারাপ করে কী লাভ বল? সবই ভাগ্য।

শুধু সন্দেহ হলে বুকের ব্যাপারটা কোন স্পেশালিস্ট দিয়ে একবার চেক-আপ করিয়ে নিতে বললেন তিনি। সুনীথ এবারও চুপ করে রইল। সে জানে সবই নিষ্ফল এখন। সিলেকশান বোর্ড বাইরের কোন ডাক্তারের মতামত মানতে বাধ্য নয়। এখানে যে একবার বাতিল হয়ে গেল তার আর কিছুই

করার নেই।

সুধা এসে ধরে—চল দাদা, সিনেমা দেখে আসি একটা। অগোছাল ঘরটা ঠিকঠাক করতে করতে বলে—ইস, কী নোংরা করে রেখেছিস সব। কোমরে আঁচল জড়িয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরটা হঠাৎ ঝাড়ামোছা শুরু করে সুধা। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে—চৈতী তোকে একটা কার্ড পাঠিয়েছে—শনিবার ওদের শো আছে, যাবি তো? সুধার চোখে একটা চাপা রহস্য। সুনীথ চুপচাপ সুধাকে দেখে। তারপর মাথা ধরার অজুহাতে তাকেও এড়িয়ে যায়।

কিন্তু কোন আঘাতই শেষ পর্যন্ত সমানভাবে টেকে না মনের মধ্যে। একটু একটু করে তার তীব্রতা ক্ষয়ে যায়ই এক সময়। গভীর দুঃখও একদিন তার মুঠো আলগা করে নেয় জীবন থেকে। সব কিছু জুড়িয়ে থিতিয়ে অবশেষে এক বিষণ্ণ স্মৃতি হয়ে তা বাঁচে। তার হাত থেকে অবশ্য কারো রেহাই নেই। সুনীথেরও ছিল না।

দুপুরের দিকে ফ্লাইং ক্লাবে যাবে মনে করে বেরিয়েছিল সুনীথ। ফেরার পর এখনো ডেভিডের সঙ্গে দেখা হয়নি। খবরটা তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলেও তার একবার যাওয়া দরকার। যাবে যাবে করে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে। প্রতিবারই একটা ব্যর্থতার অনুভূতি, একটা গ্লানিবোধ তাকে বাধা দিয়েছে। ডেভিড তাকে দেখলে হয়ত আর তেমনি উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন না এবার। রিখির টলটলে চোখে তার জন্যে হয়ত একটু করুণার আভাস ফুটবে। অন্য সবাইও তার দিকে তাকিয়ে সিলেকশান বোর্ডের প্রত্যাখ্যাত একজন ক্যাডেটকে দেখবে। চারিদিকে কিছু সহানুভূতি, কিছু সান্ত্বনার কথা শোনা যাবে তাকে কেন্দ্র করে। চিত্রটা কল্পনা করতেই তার যাবার ইচ্ছেটা আবার দপ করে নিভে যায়। পথ বদলে অন্য রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে সে।

কিন্তু কোথায় যাবে? সমর ওরা এখন অ্যাকাডেমিতে। গুপ্ত চলে গেল বাইরে। কোন সিনেমা হলে বসে বরং সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। হঠাৎ চৈতীর কথা মনে হল একবার। চৈতী তার ফাংশানের একটা কার্ড পাঠিয়েছিল; সেটা উপলক্ষ করেই তাকে গিয়ে বলতে পারে যে, সে আসতে পারেনি বলে খুবই দুঃখিত। খুব শোভন ব্যাপার হবে সেটা। তারপর তাকে একটা সিনেমা দেখানোরও প্রস্তাব করা যেতে পারে। পরিকল্পনাটা বেশ ভালই লাগে সুনীথের।

ইচ্ছে থাকলেও সে চৈতীকে নিয়ে একলা কোথাও যাবার সুযোগ পায়নি কোনদিন। অনেক বন্ধুবান্ধব চৈতীর। তারপর আছে তাদের নাচ গান নাটকের

শৌখিন আসর। একটা না একটা কিছু লেগেই আছে সেখানে। অথচ অনেকদিন মনে মনে তার কথা ভেবেছে সুনীথ। বিশেষ করে সুধার জন্মদিনের সেই ঘটনার পর।

খুব উৎসাহ নিয়ে ছুটোছুটি করে পরিবেশন করছিল চৈতী। একতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে একতলায়। ভাঁড়ার ঘর নিচেয়। সেখান থেকে বালতি বোঝাই মিষ্টি নিয়ে দুদ্দাড় করে উঠতে উঠতে কী ভাবে তার শাড়ির আঁচলটা খুলে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার একটা হাত তখন খালি থাকলেও সেটা তেল মশলা মিষ্টির ছোপে জবজবে। বিব্রত হয়ে সে এদিক ওদিক তাকায়।

সিঁড়ির মুখে সুনীথ, নিচেয় নামছে। কিন্তু নামবে কি উঠে যাবে এই দ্বিধায় জড়োসড়ো। দাঁতের নিচেয় ঠোঁট চেপে ধরে চৈতী তার অসহায় অবস্থাটা একটু সামলে নেয় যেন। তারপর খুব সহজভাবে তাকে আহ্বান করে—সুনীথ, প্লীজ, আমার শাড়ীটা একটু তুলে দাও না।

ওর দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না সুনীথ। কেমন একটা শিউরে ওঠা ভাব তার শরীরে ঝলক দেয়। এমনিতে চৈতীর বুকের গড়ন স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশি উন্নত। চলাফেরার সময় যেটা চোখে না পড়ে যায় না। এখন হঠাৎ আঁচলহীন অবস্থায় সেটা তীরের ফলার মতো তাকে বিদ্ধ করে। বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বল ড্রপ খেতে থাকে।

মাথা নিচু করে অগত্যা চৈতীর পায়ের কাছ থেকে লুটিয়ে থাকা আঁচলটা কুড়িয়ে নিল সে। তারপর আলতো হাতে ছেড়ে দেয় তার কাঁধের ওপর।

চৈতী কোমরে ঢল তুলে বেঁকে দাঁড়ায়—এইখানটায় একটু গুঁজে দাও না ভাল করে। আবার শিরায় শিরায় একটা উষ্ণ স্রোতের ঝলক। চৈতীর নরম শরীরের উত্তাপ তার হাতের মুঠোয়।

শাড়িটা আটকানো শেষ হতেই তার দিকে তাকিয়ে নাক কুঁচকালো চৈতী —আমি কি অস্পৃশ্য সুনীথ? আমায় ছুঁলে কি তোমার জাত যাবে?

বলেই সে সেই তেল মিষ্টিতে জবজবে হাতে সুনীথের নাকটা টেনে দিয়ে আবার এক লাফে দু-তিনটে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল যে, সুনীথ ভাল করে কিছুই বোঝবার অবকাশ পেল না।

বোঝার মতো মনের অবস্থাও তার ছিল না। মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করছিল কেবল। খেতে বসেও চৈতীর দিকে তাকাতে পারে না সে। অথচ চৈতীর যেন কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। সমান হাসিঠাট্টায় একাই মাতিয়ে রেখেছিল সবাইকে।

যাবার আগে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেমন সহজভাবে তাকে বলল—একদিন এস না সুনীথ বাড়িতে, তোমাদের ফ্লাইংয়ের গল্প শুনবো। ইচ্ছেমতো আকাশে উড়ে বেড়াও, কী মজা তোমাদের! আমায় একদিন তুলবে তো তোমার পুষ্পক রথে?

বলতে বলতে শরীর মুচড়ে এক রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে তুলল চৈতী। একটা মাপা হাসি তার বিস্ফারিত ঠোঁট দুটোকে সুন্দরভাবে কাঁপায়। চোখে-মুখে উথলে ওঠে এক দুর্বোধ্য কৌতুক।

সুনীথ ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নাড়ে শুধু।

তারপর আরও কয়েকবার চৈতীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তাকে যেন অন্যরকম লাগে। সেদিনকার সেই ঘটনা সে হয়ত ভুলেই গেছে। হয়ত তার কাছে এটা নেহাত একটা ঠাট্টার ব্যাপার। এ সব সামান্য ঘটনা তার মতো মেয়েকে বিচলিত করে না। খামোকা সুনীথ সেটা মনে করে রেখেছে।

সুধার সঙ্গে দু-একবার চৈতীদের ফাংশানেও গেছে। নৃত্যনাট্যের আসরে চৈতীর চোখ-ধাঁধানো নাচ মুগ্ধ হয়ে দেখেছে বসে বসে। চারদিকে দর্শকদের হাততালির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মনে মনে কেমন আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে। সারা হলের লোক এই মুহূর্তে যার প্রশংসায় মুখর, সেই চৈতী তার চেনা। তারই আমন্ত্রণে সে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে। শো শেষ হবার পর একটা তীব্র আবেগ নিয়ে চৈতীকে অভিনন্দনও জানাতে গেছে। কিন্তু তাকে ঘিরে তখন আরও অনেকে।

মেয়েদের চেয়ে ছেলের দলই বেশি। প্রশংসা আর অভিনন্দনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে চৈতীর মুখ। আনন্দে আর উত্তেজনায় যেন ছটফট করতে করতে সে হাসছে, গল্প করছে, ভ্রূ বাঁকিয়ে নানা ধরনের কটাক্ষ করছে।

সুনীথ দূর থেকেই ফিরে যায়। হলের মধ্যে বসে যে কথাগুলো ভেবেছিল তা আর তখন বলা যায় না চৈতীকে।

তবু মাঝে মাঝেই চৈতীকে মনে পড়ে। জমকালো পোশাকে রঙিন আলোর বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে নাচছে। তার প্রতি পদক্ষেপে মধুর সুরের বাজনা। তার হাতের মুদ্রায়, চোখের ইঙ্গিতে আলোর রঙ পালটে যায়। দেহলাবণ্যের ঢেউ নেপথ্যের বেহালা-সেতার-এস্রাজের মিলিত বাদ্যবৃন্দে ঝড় তোলে।

অথবা আর এক দৃশ্যের স্মৃতি। সিঁড়ির মুখে মৃদু আলোর নিচে বিস্রস্তবসনা চৈতী তাকে পরম বিশ্বাসে আহ্বান করে—সুনীথ প্লীজ, আমার

শাড়িটা তুলে দাও না। তার চোখে মুখে লজ্জা আর কৌতুকের ঝলক।

একটা গোপন সঞ্চয়ের মতো এই রূপগুলো মনের মধ্যে কোথাও রয়ে গেছে। কখনো কখনো তাকে নিয়ে এক রোমাঞ্চকর কল্পনাও করেছে সুনীথ।

বরাবর জাঁকজমক আর গ্ল্যামারের দিকে টান চৈতীর। একদিন কী করে তার এই সাধ খুব সহজেই মেটাবে তার কল্পনা। দৃশ্যটা ভেবে নিয়ে মনে মনে বলেছে—সময় আসুক, আমি তোমায় দেখে নেব চৈতী।

পাইলট অফিসারের য়ুনিফর্ম পরে বুকে ঈগল লাগিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে সে চৈতীকে পাশে নিয়ে ঘুরছে। ক্রীম রঙের হুড খোলা ছোট্ট একখানা গাড়ি কিনেছে সে তখন। চৈতীকে প্রতি মুহূর্তে তাক লাগিয়ে ট্র্যাফিক সিগনালের পরোয়া না করে শাঁই শাঁই করে ছুটছে তার গাড়ি। তার ডান হাতে স্টিয়ারিং. কব্জি থেকে ঝুলছে চওড়া ঝকঝকে স্টীলের ব্যান্ড। বাঁ হাতের খুব কাছে চৈতী। প্রতিটা টার্নিং-এ তার দুরন্ত নরম দেহের স্পর্শ। চুলগুলো সামলাতে মাথায় স্কার্ফ বেঁধেছে চৈতী। তবুও তীব্র হাওয়ার বেগে দু-এক গোছা উদ্যত হয়ে সুনীথের গালের ওপর বুরুশের মতো পিছলে যায়। অভাবনীয় এক আনন্দের অনুভূতিতে থেকে থেকে শিউরে উঠছে তার বুক। ঝম ঝম করে বাজনার মতো বাজছে শরীর......

হাঁটতে হাঁটতে চৈতীদের বাড়ির সামনে আসতেই এবার চমক ভাঙে সুনীথের। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে। যাবে কি? তারপর কী ভেবে হঠাৎ লন পেরিয়ে সোজা উঠে গিয়ে সে কলিং বেলটা টিপে দিল।

চৈতী নিজেই দরজা খুলল এসে—কী ব্যাপার সুনীথ?

খুব অবাক হয়ে সে সুনীথকে দেখে। বাইরে বেরোবার মতো সাজগোজ চৈতীর। সুনীথ বলল—তুমি কোথাও বেরুচ্ছ কি?

চৈতী হাসল—না হয় পরেই বেরোব. এস তুমি ভেতরে এস।

—না। বরং বাইরেই চল কোথাও, একটু বেড়াই।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়ে সুনীথ। চৈতী হাসল—বেশ একটু দাঁড়াও তাহলে. এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

বাইরে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসছে। চৈতীর চোখে মুখে বিকেলের আলো। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে একবার সুনীথকে দেখে—সুধা বলছিল, তুমি নাকি বাড়ি থেকে বেরোনোই বন্ধ করে দিয়েছ?

হাত তুলে রোদ অড়াল করে তাকে দেখছে চৈতী। চওড়া নীল পাড়ের

একখানা শাড়ি পরেছে সে আজ। গলায় নীল পাথরের মালা। চোখে মুখে গাঢ় রঙ। একটু যেন মেদ জমেছে শরীরে। আরও ভারী লাগছে সামনে থেকে।

প্রশনটা শুনে সুনীথ একটু ঘাবড়ে যায় প্রথমটা। তারপর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে খুব সহজভাবে বলে—কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হল। তুমি কেমন আছ চৈতী?

—ভালই, মুখের ভাবটা পালটে সে বলে—কিন্তু তোমার খবর সব শুনলাম, ভেরি স্যাড। তুমি এখন কি করবে সুনীথ?

চৈতী আবার সেই অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা তুলতে চায়। ভাল লাগে না সুনীথের। একটা অধৈর্যের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—ছেড়ে দাও ওসব কথা। তারপর তোমাদের আসর কেমন চলছে বলো?

চৈতী তবু সেই বিষণ্ণ ভাবটা ধরে রাখে—সবার জীবনেই একটা না একটা অ্যাম্বিশান থাকে, কিন্তু ক'জনের তা সার্থক হয় জীবনে? ভেরি ফিউ। এর জন্যে শুধু শুধু আফসোস করে লাভ নেই। তুমি বরং অন্য কোন—

কথাটা শেষ করে না সে। পরক্ষণেই গলার স্বরটা গাঢ় করে বলে—তোমার শরীর-টরীর এখন ভাল তো?

এসব সান্ত্বনার কথা শুনতে আর মোটেই ভাল লাগে না সুনীথের। সব কিছু উপেক্ষা করার মতো একটা স্মার্ট ভঙ্গিতে সে আবার কাঁধটা ঝাঁকায় —খুব ভাল, আমায় দেখে কি কিছু খারাপ মনে হচ্ছে?

—না, তা নয়, তবে আগের চেয়ে একটু শুকনো শুকনো লাগছে যেন।

—সেটা হয়ত ভয়ে।

—ভয়? কিসের আবার ভয় তোমার?

—হয়ত তোমার।

চৈতীর মুখটা যেন জ্বলে উঠল। চোখেমুখে সেই অপূর্ব ভঙ্গির খেলা।

—আমি খুব একটা ভয়ংকর লোক বুঝি?

—বরং ঠিক উল্টো, সেজন্যেই তো ভয়।

এমন সাজানো কথাটা বলতে পেরে বেশ একটা জোর পায় সুনীথ। ব্যক্তিত্ব নিয়ে বুক টান করে সে এবার চৈতীর দিকে তাকায়।

—তুমি কি খুব ব্যস্ত চৈতী? চল না, কোথাও বসে একটু চা খাই।

চৈতী ইতস্তত করে—ব্যস্ত নয় ঠিক, তবে—আচ্ছা চল খানিকটা বসি।

চৈতীর ইতস্তত ভাবটা ইচ্ছে করেই আমল দেয় না সুনীথ। তার নিজের চাওয়াটাই এখন জরুরী। একটা অধিকার-বোধের নেশা তাকে পেয়ে বসে।

মনে হচ্ছিল, সবার এবং সব কিছুর আকর্ষণ থেকে চৈতীকে কোথাও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কোন বাধা সে মানবে না এখন। মনে মনে দুঃসাহসিক কোন ঘটনার নায়ক হতে ইচ্ছে করে। চৈতীকে নিয়ে শক্তিশালী কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করার মতো একটা ইচ্ছে।

চৈতী হাঁটতে হাঁটতে অনেক খবর শুনিয়ে যায়। সুধা কি বলছিল তার দাদার সম্বন্ধে। কার বিয়ে হল সেদিন। কে কোথায় এখন কী করছে। অশোক নাকি আর্মিতে কমিশন পেয়েছে। সে এখন রীতিমত লেফটেন্যান্ট লাহিড়ী! কী গোঁফ রেখেছে বাবা একখানা! একেবারে যেন ব্রিগেডিয়ার। অমিত তো মেরিন ইঞ্জিনীয়ার। ওর জাহাজ এখন পশ্চিম জার্মানীতে। ডিসেম্বার নাগাদ আসছে কলকাতায়, চিঠি দিয়েছে। কী সব মজার মজার কথা লিখেছে জাহাজের লোকদের সম্পর্কে।

কে অমিত, ঠিক ধরতে পারে না সে। তবুও মুখে কিছু বলে না। দৃঢ় পদক্ষেপে চৈতীকে নিয়ে চুপচাপ হাঁটতেই তার ভাল লাগছিল। যা বলার চৈতীই বলুক, সে শুধু শুনবে এখন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে চুপচাপ থাকতে দেয় না চৈতী। দুম করে আবার তার প্রসঙ্গে ফিরে আসে—তুমি কিছু ভেবেছ সুনীথ, এখন কী করবে?

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা দুটো ঠুকে ঠুকে হাঁটছিল সুনীথ। হঠাৎ স্প্রিং-এর মতো ঘুরে গিয়ে একবার চৈতীকে দেখল। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল—খুব সাংঘাতিক একটা কিছু।

চৈতী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে—আচ্ছা?

একটা সিনেমা হলের লাগোয়া রেস্তরাঁয় এসে ওরা বসল। পর্দা ঢাকা সুন্দর কেবিন। দেয়ালে নতুন পালিশের গন্ধ। টেবিলে ফুল। মোটামুটি অভিজাত পরিবেশ। বিকেলের শো শুরু হতে এখনো ঘণ্টা দুয়েক বাকি। ইচ্ছে করলে এখান থেকেই উঠে সিনেমা হলে গিয়ে বসা যায়।

—কী খাবে বলো? একটা সিগারেট ধরিয়ে সোফায় হেলান দিল সুনীথ।

—স্রেফ চা, আমার খিদে পায় না এখন।

—অন্য কারো তো পেতে পারে, সুনীথের মুখে চাপা হাসি—তাছাড়া শুধু চা খেলে যে আমাদের তুলে দেবে এখান থেকে। একটা কিছু খাও।

—তুমি কি অনেকক্ষণ বসে থাকতে চাও?

—এমন সঙ্গী পেলে কে না চায়?

একটু অবাক হয়ে ওকে দেখল চৈতী। তারপর মৃদু হেসে ভুরু বাঁকাল। বেয়ারাকে ডেকে চা আর ওমলেটের অর্ডার দিল সে। কেবিনের মধ্যে

একটু গুমোট। বাইরে সুন্দর হাওয়া ছিল আজ। ফ্যানটা খুলে দিল সুনীথ। রেগুলেটারহীন পাখা হঠাৎ তীব্র ঝড়ের মতো হাওয়ায় ভরে দেয় কেবিনটা।

—খুব গরম লাগছে তোমার? চৈতী একটু নড়েচড়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসল। তার স্ফীত স্তনের ধাক্কায় ফুলদানিটা সামান্য কেঁপে ওঠে।

—খুব না, চলুক একটু। ওর হাতের ওপর হাত রেখে স্বচ্ছন্দে আশট্রেটা তুলে আনল সুনীথ। একটু যেন জড়োসড়ো হয়ে থাকে চৈতী।

—তোমাদের আবার কবে শো আছে, এ মাসে? সুনীথ ওর মুখের দিকে তাকায়।

—এ মাসে আর নেই, কেন?

—এমনিই। যেতাম একদিন, সেদিন যেতে পারলাম না। শরীরটা খারাপ ছিল।

বেয়ারা চা ওমলেট রেখে গেল। সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে চায়ে চুমুক দেয় সুনীথ। চৈতী মাথা নিচু করে চায়ের কাপটা তুলে নেয়।

—একটা সিনেমায় গেলে কেমন হয়, যাবে? হঠাৎ মনে আসার মতো কথাটা বলে ফেলে সুনীথ।

চৈতী মৃদু হাসল—তুমি যাও, আমি এখন উঠছি।

—তুমি যাবেই?

—আমার যে একটু তাড়া আছে। ভ্রূ তুলে মাথা নাড়ল চৈতী। সুন্দর ভঙ্গিতে তার ঠোঁট বেঁকে যায়, চোখের পাতা কাঁপে তিরতির করে—আজ নয় অন্য একদিন। তুমি আমায় আগে একটা ফোন করে দিও, কেমন?

ভীষণ সাহসী হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে এখন সুনীথের। ভিতরের সেই জোরালো ইচ্ছেটা যেন মরীয়া হয়ে ওঠে—কিন্তু আমি যদি তোমায় এখন না যেতে দি—জোর করে আটকে রাখি আজ?

বলতে বলতে সে হঠাৎ দু' হাত বাড়িয়ে চৈতীকে বুকে টেনে নেয়। সমস্ত শরীর দিয়ে জড়িয়ে যেন তার উষ্ণ দেহটার তাপ অনুভব করতে চাইল সুনীথ। মুখ নামিয়ে তার রঙিন ঠোঁট দুটোও সজোরে চেপে ধরতে যায়।

মুহূর্তের মধ্যে চৈতীর নরম শরীরটা কঠিন হয়ে উঠল। আড়াআড়িভাবে শক্ত হাতে সে সুনীথকে বাধা দেয়—না না, প্লীজ না। তুমি অসুস্থ সুনীথ, তোমার এই অসুখটা ভাল নয়।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার সোজা হয়ে বসল চৈতী। উত্তেজনায় মুখটা লাল। দু' হাতে মাথার চুলটা ঠিক করতে করতে বলল—ছিঃ সুনীথ।

একটা দমকা ঘূর্ণি যেন হঠাৎ তাকে শূন্যে তুলে নাচিয়ে আবার ফেলে

দিয়ে গেল। করুণ চোখে সে মাথা নিচু করে বসে থাকে। কত সহজ অথচ কী দুর্বোধ্য চৈতী! তার ভিতরের সব জোর যেন এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিল সে। তার কথাগুলো সমস্ত অনুভূতির মধ্যে হুল বিঁধিয়ে দিতে লাগল। চৈতীর চোখে সে এখন অসুস্থ, অস্বাভাবিক।

কিন্তু কোন্ অসুখটার কথা বলতে চায় চৈতী? বুকের মধ্যে সেই অদ্ভুত অনিশ্চিত শব্দটা কি সেও শুনতে পায়? নাকি, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করার এই বেপরোয়া বাসনাটা তার অসুস্থ মনে হয়? চলে যাবার আগে চৈতী তার দিকে তাকিয়ে আর একবার নিঃশব্দে হাসল—তুমি ভীষণ আনব্যালান্সড হয়ে পড়েছ সুনীথ। তুমি বরং বাড়ি যাও এখন।

ঠিকমত কোন উত্তর দিতে পারে না সুনীথ। তার ভিতরে ভিতরে একটা অক্ষম আক্রোশ ফেনিয়ে ওঠে। সব কিছু কেমন আকস্মিক ভাবে ঘটে গেল। এর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না সে। চৈতীকে দারুণ নিষ্ঠুর মনে হয় এখন। তার সুন্দর মুখশ্রী, সাজগোজ করা আকর্ষণীয় দেহ, ভ্রূভঙ্গি ভরা কটাক্ষ, সব।

উদ্দেশ্যহীন হয়ে আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় সুনীথ।

শেষ পর্যন্ত একটা সিনেমা হলেই সে ঢুকে পড়ল। ছবি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, বহু পুরোনো একটা সুদীর্ঘ ইংরেজি ছবি। নানারকম অ্যাকশন উত্তেজনায় ভরা দৃশ্য সব। খুব মনোযোগ দিয়ে সে গল্পটা অনুসরণ করতে চেষ্টা করে।

ছবির দ্বিতীয় ইন্টারভেল-এ সে বাইরে এল। তলপেটটা ভারী হয়ে উঠেছে। বাইরে বেরিয়ে হঠাৎ জয়দীপের সঙ্গে দেখা। অনেকদিন পর তাকে দেখল সুনীথ। সিনেমা হলের লাউঞ্জে একদিকে বার। সেখানে এক কোণে গ্লাসে বীয়ার ঢেলে চুপচাপ বসে আছে জয়দীপ। সুনীথকে দেখতে পেয়েই ডাকল।

টয়লেটের সামনে লম্বা লাইন। সেখান থেকেই হাত নেড়ে সুনীথ ইশারায় বোঝাল—ওয়েট, কাজটা সেরে তবে আসছি। জয়দীপ মুখ গোল করে ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে হাসল।

এখানকার এয়ারফোর্স স্টেশনের জুনিয়ার অফিসারদের মধ্যে জয়দীপই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার আদর্শ। তরুণ ফ্লাইং অফিসার জয়দীপ সেন, ছিপছিপে লম্বা স্মার্ট চেহারা। সপ্রতিভ আকৃতির সঙ্গে একটু যেন মেয়েলী

কমনীয়তার মিশেল। হাসলে গালে সামান্য টোল খায়, ঠোঁটের ওপরে ভেসে ওঠে একটা নীলচে তিল। স্কোয়াড্রনের বন্ধুরা আদর করে ডাকে—জয় ডার্লিং। ওভারঅল মোড়া তার ছিপছিপে শরীরটা যখন ডাকোটার কক্‌পিট থেকে দোল খেয়ে নেমে আসে, তখন দূর থেকে তাকে ঠিক একজন ব্যালে ডান্সারের মতো লাগে। মাটিতে পা দিয়েও যেন তার ওড়া শেষ হতে চায় না। হাল্কা দেহটা হাওয়ার স্রোতে যেন টগবগ করে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে।

ইদানীং বড় বিষণ্ণ জয়দীপ। সাংঘাতিক এক প্লেন অ্যাকসিডেন্টের পর ও এইরকম হয়ে আছে। সরাসরি কোন প্লেন ক্র্যাশ দেখবার অভিজ্ঞতা সেই প্রথম সুনীথের।

রানওয়ে ছেড়ে সেদিন একটুখানি উঠতেই বিশ্রীভাবে কাত হয়ে পড়ল জয়দীপের প্লেনটা। সামনে বড় বড় গাছ, পলাশ পাকুড় মাদারের লাল হয়ে যাওয়া জঙ্গল। আর একটু এগোলেই অবধারিত সংঘর্ষ। ডান দিকের ইঞ্জিনটা বন্ধ, সেইভাবেই একদিকে ঝুলতে ঝুলতে রানওয়ের শেষ প্রান্ত থেকে আবার মুখ ঘুরিয়ে এনে মাটিতে নামতে চাইল সে।

প্রায় একশ ফুট দীর্ঘ ডানার মেশিনটাকে গাছপালা মাটির এত কাছাকাছি থেকে সব কিছুর সংস্পর্শ বাঁচিয়ে নিরাপদে নামানো অসম্ভব। বিপন্ন ডাকোটার বীভৎস গর্জন ততক্ষণে সবাইকে বাইরে টেনে এনেছে। কিন্তু হায়! অসহায়ভাবে সেই চরম মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই কারো। শেষ পর্যন্ত রানওয়ের ওপর থেকে ছিটকে গিয়ে উলুখড়ের জঙ্গল ছিঁড়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে থামল প্লেনটা। কিন্তু পর মুহূর্তেই লকলকে আগুন আর ধোঁয়ায় ভরে উঠল জায়গাটা। সবার সঙ্গে সুনীথও ছুটল সেই আগুন লক্ষ করে।

কী অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সেই বাঁচা! ভাবলে মাথা টাল খেয়ে যায় এখনো।

কো-পাইলট শর্মা জয়দীপকে পিছনের দরজা দিয়ে টানতে টানতে নামিয়ে এনেছে তখন। রেডিও অফিসার আর ন্যাভিগেটার দু'জন তার আগেই লাফিয়ে পড়েছে এমারজেন্সী দরজা দিয়ে। জয়দীপ সম্পূর্ণ অক্ষত। অথচ তার চোখে-মুখে এক ভয়ার্ত বিহ্বল দৃষ্টি। এই বেঁচে যাওয়াটা বোধ হয় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। ফ্যালফ্যাল করে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে তার এয়ারক্র্যাফটের কঙ্কালটার দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্য কোনদিকে তার লক্ষ্য নেই।

এ-রকম দেখা ভাল নয়। স্কোয়াড্রন লীডার মূর্তি তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরিয়ে তার মুখে গুঁজে দিলেন। চোপরা দুম করে একটা ঘুষি

মারল তার মুখে। পরক্ষণেই আবার জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল—জয়, মাই ডার্লিং, য়ু হ্যাভ ডান এ মিরাকল!

শেষ পর্যন্ত একটা গাড়িতে তুলে জয়দীপকে হাসপাতালে নিয়ে গেল ওরা।

দেরাদুন যাবার আগেও দেখে গিয়েছিল কপালে একটা লিউকোপ্লাস্টের ক্রস লাগিয়ে ঘুরছে জয়দীপ। দুর্ঘটনার স্মৃতিটা যেন তখনো আড়াআড়িভাবে গাঁথা ছিল তার কপালের সঙ্গে। এখন আর সে চিহ্নটা নেই। হয়ত অনেক ভিতরে গভীর দুঃস্বপ্নের মতো কোথাও চেপে আছে সেটা। ওর চোখে মুখে তার স্পষ্ট ছায়া।

—তুমি হায়দ্রাবাদ গেলে না, জয়?

মাথা নেড়ে মৃদু হাসল জয়দীপ—নাঃ, গেলাম না। তাছাড়া, এখনো এনকোয়ারি চলছে—

হায়দ্রাবাদে ওর বাবা আর নতুন-মা থাকেন। সেখানে এক বিখ্যাত ব্রুয়ারির ম্যানেজার ওর বাবা। নিজের মাকে হারিয়েছে ও খুব ছোটবেলায়। কিছুকাল আগে বাবা তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী বিপাশা দেবীকে বিয়ে করেছেন। খবরটা পেয়ে প্রথমদিকে বাবার ওপর একটা তীব্র আক্রোশে ভরে থাকত তার মন। মনে হত বাবার সঙ্গে তার সামান্য যোগটুকুও বুঝি ছিঁড়ে গেল। কিন্তু প্রথমটা খারাপ লাগলেও শেষ পর্যন্ত এই মাকে দেখে খুশিই হয়েছে সে। বরাবর হস্টেলে হস্টেলে আত্মীয়-পরিজনহীন জীবনে যে অভাববোধটা তাকে নিঃসঙ্গ করে রেখেছিল, বিপাশা দেবী যেন তারই কিছুটা পূরণ করে দিয়েছেন।

—ক্র্যাশের ঘটনাটা মাকে কিছু লিখেছ নাকি জয়? ওর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট টেনে নিতে নিতে সুনীথ জিজ্ঞেস করে।

—নাঃ। একটা নিঃশ্বাস ফেলে জয়দীপ মাথা নাড়ল।

মাকে ও খোলাখুলি সব কথা লেখে। কিন্তু এই ব্যাপারটা বোধ হয় জানাতে চায় না। বেয়ারাকে ডেকে একটা গ্লাস চাইল জয়। তারপর সেটা ভর্তি করে সুনীথকে এগিয়ে দেয়। সুনীথ বাধা দেবে দেবে মনে করেও কিছু বলল না। তার খানিকটা ইচ্ছেই করছিল ড্রিংক করতে। এভাবেই যদি খানিকক্ষণের জন্যে অস্বস্তিকর এলোমেলো চিন্তাগুলোকে ডুবিয়ে রাখা যায়।

জয়দীপ ওর সোনালী লাইটারটা জেবলে সিগারেট ধরিয়ে দিল। এই লাইটারটা সনীথের চেনা। তারও একটা আছে। সেটার রঙ অবশ্য কালো। জয়দীপের মা একই সঙ্গে তাদের দুজনকে এ দুটো উপহার দিয়েছিলেন।

অ্যাকসিডেণ্টের খবরটা পেলে বিপাশা দেবী এতদিন নিশ্চয়ই ছুটে আসতেন হায়দ্রাবাদ থেকে। বাবার সঙ্গে জয়দীপের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। ছাত্রজীবনে তিনি ছেলেকে প্রয়োজনমতো টাকা পাঠিয়ে গেছেন, চিঠিপত্র ক্বচিৎ কখনো লিখেছেন। অথচ তার নতুন মা এখন প্রায় নিয়মিত চিঠি লেখেন, ছুটি নিয়ে হায়দ্রাবাদ ঘুরে আসার জন্যে বার বার তাগাদা আসে তাঁর কাছ থেকে। সবসুদ্ধ চারবার কি পাঁচবার মাকে দেখেছে জয়দীপ। তবু তাঁর সম্বন্ধে কত গল্প শুনেছে সুনীথ। শেষবার তিনি যখন এসেছিলেন তখন সুনীথের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল তাঁর।

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুশ্রী মার্জিত চেহারা। অদ্ভুত সুরেলা গলার স্বর। খুব ভালবাসেন জয়কে। একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো আচরণ। জয়দীপ মাকে একখানা দামী বেনারসী উপহার দিল সেবার। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কিনলেন ছেলের জন্যে স্যুটের কাপড়, বিদেশী সিগারেট লাইটার। সুনীথকেও সঙ্গে থেকে একটা টাই আর একটা লাইটার উপহার নিতে হয়েছিল। কোন আপত্তি মানবেন না তিনি। কথা দিতে হল, সেও যাবে একবার হায়দ্রাবাদে জয়দীপের সঙ্গে।

—প্রমিস সুনীথ, তুমিও এবার আসছ হায়দ্রাবাদে, জয়দীপের কাঁধে হাত রেখে তার দিকে সোজা তাকিয়ে রইলেন বিপাশা দেবী। যেন এখনি তার জবাব চাই।

মাথায় বয়েজকাট চুল, বাঁ দিকের সরু সিঁথিতে এক চিলতে সিঁদুর, গাঢ় কমলা পাড়ের সবুজ শাড়ি, সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর অনুরোধ যেন আদেশের মতো। সম্মোহিত সুনীথ মাথা নেড়ে বলেছিল—আই প্রমিস।

জয়দীপ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে—এবার তোমার খবর বলো সুনীথ।

—বলার মতো কিছু নেই জয়, শেষ পর্যন্ত মেডিক্যালে আটকে গেলাম।

—সে খবর আমি পেয়েছি, কিন্তু তোমার ডিফেক্টটা কোথায়?

কপালে আঙুল ঠেকিয়ে দেখায় সুনীথ—বোধ হয় এইখানে; এইখানেই

আমার সব কিছু আটকে গেল। বোর্ডের ধারণা, আমার হার্টে একটা মার্মার আছে, অতএব সব শেষ।

জয়দীপের চোখ দুটো যেন ঝিলিক মেরে উঠল—ওঃ, অল সিলি। আমি একজনকে জানি, ক্যাপটেন কাপুর, তারও নাকি এই কমপ্লেন ছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল এটা কিছুই না। সে বড় বড় স্পেশালিস্ট কনসাল্ট করল, ই সি জি করিয়ে দেখল কোন ডিফেক্ট নেই, সব নরমাল। শেষে কাপুর কমারশিয়াল লাইনে চলে গেল। এখন সে দিব্যি ফ্লাই করছে। কমারশিয়াল লাইনের একজন নামকরা পাইলট ক্যাপটেন কাপুর। তুমিও তাই কর সুনীথ। আমি বলছি, তুমি নিশ্চয়ই খুব ভাল করবে এ লাইনে। এতদূর এগিয়ে তুমি কখনো ফ্লাইং ছেড়ো না, বরং চ্যালেঞ্জ হিসেবে এটা চালিয়ে যাও।

বীয়ারের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল সুনীথ। ফিকে হলুদ পানীয়ের মাথায় একরাশ সাদা ফেনা কেমন টোপর হয়ে ফুলে উঠছে। টুকরো কাচের দানার মতো অসংখ্য বিজগুড়ি সমানে ফুটছে গ্লাসের মধ্যে। মনে পড়ছিল, অনেকদিন আগে তার সামনে এয়ারফোর্সের জীবন সম্পর্কেও এমনি এক দারুণ উত্তেজনার ছবি তুলে ধরেছিল জয়। অ্যাডভেঞ্চার, মর্যাদা আর ক্ষমতার চোখ ধাঁধানো ছবি। বিশাল শূন্যের মধ্যে একদিন তার ফাইটার নিয়ে ওড়ার কল্পনাকে উৎসাহ দিয়ে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল সে। কথাটা বোধ হয় এখন ভুলে গেছে জয়। অথবা পরিস্থিতি বুঝে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছে।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে আবার বলতে শুরু করে জয়দীপ—এই সামান্য কারণে এত হতাশ হবার কী আছে। আমি বলছি, এই শব্দটা এমন কিছুই নয়। এটা হয়ত আসলে আমাদের মনের জোরালো কোন ইচ্ছের প্রমাণ। বিশেষ মানসিকতার চাপে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক একটা ক্রিয়া। হয়ত আমার যা ভীষণভাবে চাই তা না পাওয়ার জন্যেই হৃৎপিণ্ডের এই বাড়তি ছটফটানি। আমার মনে হয় সুনীথ, সবার মধ্যেই একভাবে না একভাবে এই শব্দটা আছে। খুব বড় অ্যাম্বিশান নিয়ে যারা জীবন কাটায়, অথবা সাংঘাতিক কোন ফ্রাস্ট্রেশান, তাদের সবার বুকের মধ্যেই বোধহয় এটা শোনা যায়। কে জানে, আমার মধ্যেও এই রকম একটা কিছু তৈরি হয়ে গেছে কি না!

জয়দীপের শেষ কথাটায় সুনীথ একটু চমকে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়। অ্যালকোহলের প্রভাবে জ্বলজ্বল করছে মুখটা। চোখ দুটো লালচে। খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার ঘোরেই যেন সে কথা বলে চলেছে।

সুনীথের গ্লাসের টোপরটা এবার চুপসে আসছিল আস্তে আস্তে।

তেষ্টায় তার গলাটা অনেকক্ষণ থেকেই শুকিয়ে ছিল। এখন গ্লাসের দিকে দেখতে দেখতে সেটা আরও বেড়ে চলেছে। হাত বাড়িয়ে হঠাৎ পুরো গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করতে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে বীয়ারের ঝাঁঝালো তেতো স্বাদে মুখটা বিকৃত হয়ে আসে। মাথার মধ্যে ঝাঁ করে একটা ঘূর্ণি পাক খেয়ে যায়।

জয়দীপ সহসা হাত থেকে গ্লাসটা টেনে নেয়—এই, করছ কি তুমি?

সুনীথ কাঁধ নাচাল—শো অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে, চল এবার ভেতরে গিয়ে বসি।

সোফায় হেলান দিয়ে শিথিল হয়ে বসল জয়দীপ—নাঃ, আমি আর যাবো না, ভাল লাগছে না।

—কেন?

—এমনিই।

সুনীথের মনে পড়ল বিরতির খানিক আগে একটা অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য ছিল ছবিতে। দাউ-দাউ করে বাড়িঘর পুড়ছে। ভয়াবহ দৃশ্য। সেই সীনটাই হয়ত জয়দীপের স্নায়ুর ওপর কোন চাপ সৃষ্টি করে থাকবে। তার নিজেরও একবার প্লেন ক্র্যাশের আগুনটার কথা মনে এসে গিয়েছিল।

—জয়, ওই আগুনের দৃশ্যটাই কি...

—একজ্যাক্‌ট্‌লি! আমি আর স্ট্যাণ্ড করতে পারছিলাম না। বাইরে উঠে এসে তখন থেকে ড্রিংকস নিয়ে বসে আছি।

—ঠিক আছে, ছেড়ে দাও তাহলে, আমিও আর যাচ্ছি না।

মুখ মুছে আর একটা সিগারেট ধরাল সুনীথ। জয়দীপের চোখ দুটো স্থির রক্তাভ। মনে মনে কিছু ভাবছে ও। প্লেন ক্র্যাশের ঘটনাটা কি? হতেও পারে। অবধারিত মৃত্যুর হাত এড়িয়ে তার স্পষ্ট চেহারাটা চোখের সামনে দেখা কি ও কোনদিন ভুলতে পারবে? এই আতঙ্কটা হয়ত ওর মনের মধ্যে কোথাও না কোথাও লেগেই থাকবে। নাকি ও এখনো সেই হৃদয়তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে যাচ্ছে মনে মনে? হৃৎপিণ্ডের ওপর আমাদের কামনা-বাসনার জটিল প্রভাব সম্পর্কে নতুন কোন ভাবনা। কিন্তু এই বুঁদ হয়ে থাকার লক্ষণটা ভাল নয়। সুনীথ ধাক্কা দেয় ওকে—

—এই জয়, আগুন দেখে কি তোমার বুকেও মার্মার ধরে গেল নাকি?

চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে ওর। সেই অবস্থায় হাসল—হতেও পারে আশ্চর্য কি? অথবা হয়ত আগেই ছিল, তাতেই বা কি? এর জন্যে তো আমার ফ্লাইং বন্ধ করে দিচ্ছে না কেউ। তোমাকেও তাই করতে হবে সুনীথ, ইউ মাস্ট।

ওই শব্দটাই তার নির্দেশ, ফ্লাইং ছাড়া তোমার অন্য পথ নেই।

বেশ রাত হয়ে যাচ্ছে। অথচ জয়দীপকে ফিরতে হবে অনেক দূর। এয়ার-ফোর্স মেস এখান থেকে কম করে কুড়ি-পঁচিশ মাইল রাস্তা। এদিকে নেশাটাও ক্রমশ চেপে ধরছে। এর পর ওর পক্ষে ফেরা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। সুনীথ তাড়া লাগাল এবার—জয়, চল এবার বেরিয়ে পড়া যাক।

—বাট দি নাইট ইজ টু ইয়াং মাই ফ্রেন্ড, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাবে তুমি? কী করবে বাইরে গিয়ে এখন?

সিগারেট জ্বালাতে গিয়ে হাত ফসকাল জয়দীপের। কিন্তু একবার টাল খেয়েও দ্রুত সামলে নিল। বে-সামাল অবস্থাটা ও এখনো চাপা দিয়ে রাখতে চায়। লাইটারটা টেনে নিয়ে সুনীথ ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিল। চোখ বুজে মৃদু হেসে ও ধন্যবাদ জানায়।

সুনীথের নিজের মাথার মধ্যেও বেশ ঝিমঝিম শুরু হয়ে গেছে। আলতো হাতে জয়দীপের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বলল—আমার আর এখানে বসে থাকতে ভাল লাগছে না জয়। এবার উঠে পড়ি চল।

—ঠিক আছে চল; কিন্তু কোথায় যাবে তুমি?

—কেন, বাড়ি।

—আর আমি?

সুনীথ ওর ভঙ্গি দেখে অবাক হয়—কেন, তুমি মেসে ফিরবে না আজ?

—অফকোর্স। কিন্তু আমার যে বাড়ি নেই সুনীথ!

জয়দীপের চোখ দুটো কেমন ভেসে উঠে চকচক করতে থাকে। গলায় এক অন্যরকম আবেগ।

মনের এই অবস্থায়ও তার ভঙ্গি দেখে হাসি পায় সুনীথের। তাকে সহানুভূতি জানাতে গিয়ে জয়দীপ এখন নিজেই মাতাল হয়ে পড়েছে। ওকেই এখন তাকে সামলাতে হবে। মন থেকে এই ভাবালুতা সরিয়ে দিতে হবে একথা ওকথা বলে। না হলে আজ রাত্রের মতো এটাই হয়ত তার মাথার মধ্যে গেঁথে থাকবে।

ওর একটা হাত মুঠো করে চেপে ধরল সুনীথ—পাগলের মতো কী যা তা বলছ জয়? ইচ্ছে করলে যখন খুশি তুমিও বাড়ি যেতে পার। ছুটি নিয়ে কিছুদিন হায়দ্রাবাদে ঘুরে এস না। বল তো, এবার আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি। মাকে কথা দিয়েছিলাম, যাবে?

—ও নো, নেভার! কেমন ছটফট করে মাথাটা দু'পাশে দোলায় সে—আমাকে হয়ত আর কোনদিন যেতে হবে না।

—ব্রী স্টেডি ডিয়ার; কেন, কী হয়েছে? যাবে না কেন?

—কী হয়েছে জানতে চাও?

বিহ্বল দৃষ্টিতে জয়দীপ তার মুখের দিকে তাকায়। তারপর পকেট থেকে একখানা ভাঁজ করা চিঠি বার করে হাতে দিয়ে বলল—এটা পড়ে দেখ, সব লেখা আছে এখানে।

চারদিকে শেড বসানো মৃদু আলো, চোখের দৃষ্টিটা ঝাপসা, তবু তার মধ্যে চিঠিটায় একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে সুনীথ একেবারে বিমূঢ় হয়ে বসে রইল। বিপাশা দেবীর চিঠি। প্রায় মাস দুয়েক আগের তারিখ। অথচ আশ্চর্য. এই নিদারুণ সংবাদটা জয়দীপ এতদিন নিজের মধ্যে চেপে রেখেছিল। এর মধ্যে ক্লাবে তার সঙ্গে অনেকবার দেখা হলেও সে ঘুণাক্ষরে কিছু প্রকাশ করেনি।

খুব সুন্দর সংযত লেখার ভঙ্গি বিপাশা দেবীর। তিনি লিখেছেন—

মাই ডিয়ার সান,

এটাই হয়ত তোমার কাছে আমার শেষ চিঠি। ইচ্ছে করলেও এরপর তোমাকে আমি কোনদিন কিছু লিখব না। কাল সকালেই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ইদানীং আমাদের দুজনের মধ্যে নানা বিষয়ে ভুল বোঝা-বুঝি, বিরোধ, কখনো বা সংঘর্ষ বেধে উঠছিল। এটা শুরু হয়েছিল অবশ্য অনেকদিন আগে, যার কিছুটা হয়ত তুমি আমার কথাবার্তা থেকে আন্দাজ করে থাকবে। আমি ব্যাপারটা গোপন করতে চেয়েও তোমার কাছে পারিনি। কিন্তু যাই হোক, সম্প্রতি এটা এমন একটা কুৎসিত পর্যায়ে পেঁৗছেচে যে, সে-কথা লিখতে আমার রুচিতে বাধে। হয়ত আমারই দোষ জয়, তবুও আমার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না। সব কথা তোমায় খুলে লেখা যায় না। কারণ, এই অরুচিকর ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে তোমাকে জড়িয়েও এমন একটা ইতর ইংগিত ছিল যা শুনে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। যে কথা শোনার পর আমি আর কখনোই সহজভাবে তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। এর পরও কি আমার এ সংসারে থাকা উচিত, না সম্ভব?

বিবাহিত জীবন সম্পর্কে মেয়েদের অনেক স্বপ্ন থাকে। তার মধ্যে অনেক আশাই হয়ত পূর্ণ হয় না। তবু অধিকাংশ মেয়েই সংসার, স্বামী, সন্তানকে ঘিরে একটা অদ্ভুত আকর্ষণের মধ্যে অন্য সবকিছু ভুলে থাকে। আমাদের বিয়েটা অবশ্য স্বাভাবিক নয়। জেনেশুনেও একটা ঝোঁকের মাথায় এই অসমবয়সী বিয়েতে আমি রাজী হয়েছিলাম। স্বভাবতই সাধারণ মেয়েদের চেয়ে বিবাহিত জীবনে আমার প্রত্যাশা ছিল অনেক কম। অথচ না চাইলেও

বিয়ের পর আমিই পেয়েছিলাম সবচেয়ে বড় একটা পাওনা। তোমার মতো একটি আশ্চর্য ছেলের মা হবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার! এই চমকপ্রদ প্রাপ্তি আমাকে যে কী পরিমাণ খুশী ও গর্বিত করে তুলেছিল তা আজ ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কিন্তু সেই অহঙ্কারই আজ যখন আমার সবচেয়ে বড় লজ্জার কারণ হয়ে উঠল তখন আমার পক্ষে এই মনোমালিন্যভরা অতৃপ্ত সম্পর্কের বোঝা বয়ে বেড়ানো অর্থহীন।

দুঃখ করো না জয়, তুমি যেখানেই থাক, চিরদিন আমার অফুরন্ত ভালবাসা আর শুভেচ্ছা তোমাকে ঘিরে থাকবে।

ভালবাসা ও স্নেহসহ

তোমার মা।

চিঠিটা পড়ে মাথা নিচু করে বসে থাকে সুনীথ। জয়দীপ তার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। প্লেন ক্র্যাশের মতোই সাংঘাতিক আর এক বিপর্যয়ের স্মৃতি এতদিন ধরে তার মনের মধ্যে সমানে ঘুরছে। অথচ সে কাউকে বলতে পারেনি এই কথাটা। বলা যায়ও না।

সুনীথ তার দুঃখটা অনুভব করতে চেষ্টা করে। বিপাশা দেবীকে সে দেখেছে। তাঁকে খুশি করার জন্যে প্রায় দিশেহারা হয়ে উঠত জয়দীপ। জয়দীপের বাবাকে অবশ্য কখনো দেখেনি। ছেলের সঙ্গে যেন একটা দূরত্ব বজায় রেখেই তিনি আছেন। এদের তিনজনের পরস্পরের অত্যন্ত নিকট অথচ জটিল সম্পর্কের মধ্যে কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা থাকলেও তা তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু এই দুর্ঘটনার ফলে জয়দীপের মানসিক যন্ত্রণা বা গ্লানির দিকটা সে অনুমান করতে পারে।

জয়দীপ আবার অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করেছে। চোখেমুখে একটা চাপা উত্তেজনার আভা। আবেগের সঙ্গে একবার বলে উঠল—আমি আর কাউকে কেয়ার করি না এখন. আমি যা খুশি তাই করতে পারি—ইয়েস. আ'ইল ডু দ্যাট।

সুনীথ তাকে একরকম জোর করে বাইরে নিয়ে এল। সামনে মাঠের মধ্যে খোলা হাওয়ায় দুজনে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। তারপর জয়দীপ কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসতেই তাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিল। ট্যাক্সি থেকে মাথা বার করে তার হাত চেপে ধরল জয়দীপ—গুড নাইট. মাই ফ্রেন্ড!

তার চোখ দুটো তখন স্পষ্টই ছলছল করছে।

চার

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না সুনীথের চোখে। মাথার মধ্যে এক প্রবল উত্তেজনার স্রোত। কখনো জয়দীপ, কখনো চৈতী তার সমস্ত চিন্তা জুড়ে ঘুরে বেড়ায়। চৈতীর চোখে সে অসুস্থ। অপ্রকৃতিস্থ। অনেক সাহস করে চৈতীকে বুকে টানতে গিয়েও সে পারল না। এই সাহস একদিন চৈতীই তাকে দিয়েছিল। অথচ কত সহজে আজ সে তাকে প্রত্যাখ্যান করল। এভাবে অপমানিত হবার কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি কখনো। সমস্ত ঘটনাটা একটা তীব্র জ্বালার মতো তাকে উত্তেজিত করে তুলছিল।

গভীর রাত এখন। সুনীথ দরজা খুলে ছাতে এসে দাঁড়ায়। পায়চারি করে। কৃষ্ণপক্ষের ম্লান জ্যোৎস্নায় চারদিকের ঘরবাড়ি গাছপালা কেমন করুণ হয়ে তার দিকে তাকায়।

জয়দীপের মুখটা ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। হাসিখুশি উজ্জ্বল জয়। বুকে সোনালী ঈগল লাগিয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় তার শরীর। আসামের দুর্গম পাহাড় জঙ্গল ডিঙিয়ে ছোট ছোট উপত্যকার মধ্যে তাব প্লেনটাকে বিপজ্জনকভাবে ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে অনায়াসে সে কতবার রসদ নিক্ষেপ করে ফিরে এসেছে। অথচ সুন্দর আবহাওয়ায় বিমান বন্দরের নিরাপদ গন্ডীর মধ্যে সে কী ভয়াবহ দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ল। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে এখনো তদন্ত চলছে। শেষ হলে জানা যাবে এর জন্য জয়দীপের দায়িত্ব কতটুকু ছিল। জয়দীপ কোন ভুল করে থাকলে তার শাস্তি অবধারিত। হয়ত তার সিনিয়রিটি খারিজ করে দেওয়া হবে, বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা। কিন্তু বিপাশা দেবীর চিঠি পাবার পর তার মনের অবস্থা নিয়ে কেউ তদন্ত করবে না। কে জানে, চিঠিখানা তখন তার পকেটেই ছিল কিনা যখন সেই অভিশপ্ত ডাকোটার কণ্ট্রোল সে মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়েছিল।

নতুন-মাকে জয়দীপ কখনোই ভুলতে পারবে না। হায়দ্রাবাদ না গেলেও তাকে বারবার মনে পড়বে। মাতৃহীন জীবনের মধ্যে এই কয়েকটা দিনের অভিজ্ঞতা স্বপ্নের মতো মনে হবে। এর জন্যে তার বুকের মধ্যেও লেগে থাকবে হয়ত একটা বাড়তি ছটফটানি। সেটাকে বুকে নিয়েই ফ্লাইং অফিসার

জয়দীপ সেন আবার আকাশে উঠবে। পাহাড়, জঙ্গল, ঝড়, বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার বিমান আবার দুর্জয় সাহসে উড়ে বেড়াবে। কে জানে. এই স্মৃতিই হয়ত তার আকাশ-জীবনের সবচেয়ে বড় প্রেরণা হয়ে উঠবে তখন।

চাঁদের আলোয় কী একটা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। তার মাথার ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে চক্কর কাটছিল ছাইরঙের ঝাপসা প্রাণীটা। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে তার ডানার শব্দ উঠছিল সাঁই সাঁই করে। হঠাৎ কী দেখে যেন ভয় পেল সেটা। সুনীথ দেখল তার মাথার ওপর থেকে তীব্র বেগে ডাইভ দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল পাখিটা। আকাশে ওড়ার সময় বিশেষ করে পাখিদের এই স্বভাব সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয় পাইলটদের। একদিনের ঘটনা মনে পড়ল তার।

প্রায় চার হাজার ফুট মতো উঁচুতে সে উড়ছিল তখন। বিকেলের শান্ত আকাশ। আকাশ ভরা সোনালী রোদ্দুর। এদিকে ওদিকে কয়েকটা টুকরো টুকরো মেঘ বাংলা বিহার আসামের ম্যাপের মতো ভেঙেচুরে ভাসছে। তার প্লেনের সামনেই জিরাফের মতো লম্বা গলা তুলে একটা মেঘ এগিয়ে আসছিল।

সে মেঘটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়। নিরাপদ মেঘ এগুলো। তবু খোলা টাইগার মথ নিয়ে ওর মধ্যে ঢুকলে স্যাঁতসেঁতে বিশ্রী অনুভূতিতে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় যেন। আকাশ থেকে এগুলো দেখতেও ভাল লাগে না। সীমাহীন শূন্যের মাঝখানে এলোমেলো ঝুলতে থাকে এই বাষ্পকুণ্ডলী, কাছে থেকে দেখলে কোন সৌন্দর্য নেই। বরং কুৎসিত লাগে।

সুনীথ ডানদিকে বেঁকে পাশ কাটাল মেঘটার। কিন্তু এয়ারক্র্যাফটের মুখটা আবার সোজা করতেই দেখতে পেল মেঘের আড়ালে একদল শকুন। সাঁই সাঁই করে বাতাসে ভর দিয়ে সোজা গ্লাইড করে এগিয়ে আসছে। সে ঠিক প্রস্তুত ছিল না এই দৃশ্যের জন্যে। অথবা মেঘের দিকে তাকিয়ে হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। শকুনগুলোকে সামনে দেখে হঠাৎ ডাইভ দিয়ে নিচেয় নামতে গেল। স্কোয়ান লীডার ডেভিড এতক্ষণ চুপচাপ বসে সব লক্ষ করছিলেন। ডাইভ দেবার উপক্রম করতেই তিনি কণ্ট্রোল ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন —য়ু ব্লাডি ফুল, য়ু উইল কিল ইয়োরসেলফ্ ওয়ান ডে।

বলেই মুহূর্তের মধ্যে মেশিনটাকে টেনে তুললেন। আর্তনাদ করে সহসা ওপরের দিকে উঠতে লাগল ডিয়ার।

পরে মেশিনটা সোজা করে বলতে লাগলেন—চিল শকুন এসব পাখিদের স্বভাব হচ্ছে সাধারণত এয়ারক্র্যাফট দেখলে এরা ডাইভ দিয়ে এগিয়ে আসতে

চায়। এটাই ওদের চরিত্র। তোমার অনেক আগেই দলটাকে দেখা উচিত ছিল। এসব সময় ওদের লাইন থেকে বেঁকে গিয়ে উঁচুতে উঠে যাওয়াই নিরাপদ। মনে রেখ, আর কখনো ওদের সামনে এভাবে ডাইভ দেবার চেষ্টা করবে না। শকুনের সঙ্গে আকাশে ক্র্যাশ করার ঘটনা আজ পর্যন্ত কম ঘটেনি।

প্রথমটা রেগে উঠলেও ডেভিড খুব ধীরভাবে তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন। কোন ভুল দেখলেই যেমন তিনি চিৎকার করে ওঠেন, পরে আবার তেমনি শান্ত মেজাজে অনেকক্ষণ ধরে ভুলগুলোর খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেন। আরও একদিন তাকে এমনি ধমক খেতে হয়েছিল।

কক্‌পিটে বসে ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার পর সে এগিয়ে যাচ্ছিল রানওয়ের দিকে। ডেভিড চেঁচিয়ে উঠলেন—নো, য়ু আর নট রেডি। কক্‌পিটের সব কিছু দেখেশুনে নিয়েছে সুনীথ, শুধু তার বেল্ট বাঁধা বাকি। এটা সে যেতে যেতে বেঁধে নেবে ভেবেছিল। ডেভিডকে অনেক সময় রানওয়ের পথে এগুতে এগুতে এটাকে আটকাতে দেখেছে। কিন্তু তার পক্ষে সেটা করা সম্ভব হল না। মেশিন থামিয়ে দিয়েছেন ডেভিড। রাগে থমথম করছে তাঁর মুখ। আয়নার মধ্যে তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দেখতে পায় সুনীথ। বেল্ট বাঁধা শেষ হলে মেশিনের সঙ্গে তিনিও গর্জন করে উঠলেন এবার—আর য়ু শ্লীপিং ইন দ্য কক্‌পিট? ফ্লাইং কোন অমনোযোগী ছেলের জন্যে নয়, তুমি যদি সতর্ক না হও, আ'ইল থ্রো য়ু আউট অব দিস।

সেদিন পর পর অনেকগুলো টেক অফ আর ল্যান্ডিং করল সুনীথ। প্রত্যেকটাই বেশ পছন্দ হল ডেভিডের। মাটি ছোঁবার পর দু-একবার তিনি তারিফও করলেন। বুঝতে পারছিল, স্কোয়ান লীডার খুব খুশি। প্লেন থেকে নেমে সোজা ক্লাবে গিয়ে বসলেন। বেলা শেষ হয়ে আসছে, আজ আর ওড়া নেই। বীয়ারের বোতল খুলে বসলেন তিনি। তারপর হঠাৎ তাকে চেপে ধরলেন—আজ কক্‌পিট চেকিং-এ এত অন্যমনস্ক হয়েছিলে কেন—হোয়াই? টেল মী হোয়াই?

সুনীথ মুখ নিচু করে বসে থাকে। কোন উত্তর দেবার নেই তার। ডেভিড তার ল্যান্ডিং দেখে খুশি হলেও কক্‌পিট চেকিং-এর ব্যাপারটা ক্ষমা করতে রাজী নন।

মুহূর্তের মধ্যে বীয়ারের বোতলটা শেষ করে আর একটা বোতলের অর্ডার দিলেন তিনি। সঙ্গে আজ রিখি নেই। ফলে পানের মাত্রা বাড়িয়ে যাওয়ার কোন অসুবিধে ছিল না। মিসেস থাকলে এসব বিষয়ে একটু সংযত হয়ে চলতে হয়।

দ্বিতীয় বোতলটা প্রায় খালি করে একটু থামলেন তিনি। তারপর সিগারেট জেবলে বললেন—লুক সানিথ, জীবনে মানুষ ভুল করেই থাকে, কিন্তু ফ্লাইং-এ সে স্কোপ নেই। অঙ্ক কষতে কষতে একবার ভুল করে ফেললে সহজেই তুমি তা ঠিক করে নিতে পারো। কিন্তু ইন ফ্লাইং—একবার ভুল করলে এ জীবনে হয়ত তুমি তা আর কখনো শোধরাবার সুযোগ পাবে না।

ডেভিড সেদিনই প্রথম তাকে একটা বীয়ার দিয়ে বললেন—কাম অন, হ্যাভ এ ড্রিংক। নিজের হাতে গ্লাস এগিয়ে দিলেন। খুব অস্বস্তি লাগছিল তার। তবু ডেভিডের নির্দেশে সামান্য খেল। আরও খানিকক্ষণ বসে বসে গল্প করলেন তিনি। ডেভিডই বলছিলেন তাঁর ইনস্ট্রাকটার জীবনের নানা গল্প। তারপর একথা ওকথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় প্রশ্ন করলেন, সানিথ, আর য়ু ইন লাভ? ঠিক করে বলো, তুমি কাউকে ভালবাস?

সুনীথ অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে দেখল। তিনি মোটেই ঠাট্টা করছেন না। রীতিমত গম্ভীর তাঁর চোখমুখের ভঙ্গি। তার কাঁধে চাপড় মেরে খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বললেন—এরকম কোন কিছু ঘটনা আছে, যা তোমাকে ট্রাবল দেয়?

সুনীথ মাথা নাড়ল—নো সার, আমার এসব কোন সমস্যা নেই।

—তবে তুমি এরকম অমনোযোগী হয়ে পড় কেন মাঝে মাঝে? তোমার ফ্লাইং সম্বন্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, আইম কোয়াইট স্যাটিসফায়েড ইন দ্যাট। কিন্তু এই ছোটোখাট ভুলগুলো কেন করবে? তোমার ওপর আমার ধারণা নষ্ট হয়ে যায় এতে। হারনেস টাইট করে দেওয়া বা ট্রিমার, থ্রটলের পজিশান দেখে নেওয়া এ তো একজন লে-ম্যানও বোঝে। আত্মবিশ্বাস ভাল, কিন্তু খুব বেশি আত্মবিশ্বাস ফ্লাইং কেরিয়ারের পক্ষে বিপজ্জনক বস্তু, সানিথ। কথাটা মনে রেখ সব সময়।

আরও খানিকক্ষণ ধরে ডেভিড তাকে অনেকগুলো ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। সুনীথ বুঝতে পারছিল এইগুলো অসংকোচে জেনে নেবার জন্যে তিনি তাকে ড্রিংক অফার করেছেন। পান করলে মানুষ সবচেয়ে বেশি খোলা-মেলা আর অসংকোচে কথা বলে। অনেকের ক্ষেত্রেই সে এটা লক্ষ করেছে।

সেদিন সন্ধ্যের পরও তারা ক্লাবে বসে রইল। ডেভিড একে একে বোতল শেষ করেন আর তার দিকে তাকিয়ে হাসেন হা হা করে—লুক, আমি একদম ফিট, কিসসু হয়নি আমার। আমি এখনো স্বচ্ছন্দে ফ্লাই করতে পারি। পট পট করে জামার বোতামগুলো খুলে ফেললেন তিনি। ভেতরে গেঞ্জি পরেন না; তামাটে রঙের বুকে একটা সবুজ উল্কি আঁকা। প্রজাপতির ছবি। সুনীথ

সেদিকে দেখতেই হাসলেন—দেখ, এটাও উড়ছে। সব সময় উড়ছে এখানে।

সমস্ত শরীরটা তাঁর ঘামে ভিজে উঠেছে তখন। সবুজ প্রজাপতির ওপর ঘামের জল গড়িয়ে যায়।

পাশের বাড়ির ঘড়িতে দুটো বাজার শব্দ শুনল সুনীথ। রাত শেষ হয়ে আসছে। চাঁদের আলোটা বেশ উজ্জ্বল এখন। ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে হঠাৎ।

পায়চারি থামিয়ে সে বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এল। ঘরে এসে জল খেল অনেকটা। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে জোর করে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। দু'বার তিনবার করে শোবার ভঙ্গি বদলালো। শরীরে গভীর অবসাদের অনুভূতি। তবুও মাথার মধ্যে সমানে দপদপ করে চলেছে। ডেভিড, রিখি, জয়দীপ, চৈতী একে একে সবাই তখনো তার চোখের সামনে এলোমেলো হয়ে ঘুরতে থাকে।

চৈতী যেন সেই রঙিন আলোর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে চোখ কুঁচকে ভর্ৎসনা করে—ছিঃ সুনীথ, তুমি অসুস্থ।

বিপাশা দেবীর হাসিভরা সুশ্রী মুখে অনুরোধ—প্রমিস সুনীথ, হায়দ্রাবাদ যাবে এবার!

কী সুন্দর সুরেলা গলা বিপাশা দেবীর! মাথায় বয়েজকাট চুল, বাঁ দিকের সিঁথিতে সরু সিঁদুর, চওড়া কমলা পাড়ের সবুজ শাড়ি!

ডেভিড হাসতে হাসতে ডিয়ারকে দেখিয়ে বলেন—সানিথ, দীস ইজ ইয়োর ওনলি গার্ল ফ্রেন্ড, সো লঙ য়ু আর ইন দ্য এয়ার!

রিখির টলটলে চোখে শিশির-ভেজা মাঠের ছায়া—তুমি একদিন খুব বড় পাইলট হবে সানিথ। এয়ারফোর্সে গিয়ে নিশ্চয়ই তুমি শাইন করবে।

জয়দীপ তার লাল চোখ মেলে ধরে—এই শব্দটা সবার মধ্যেই একভাবে না একভাবে আছে। খুব বড় কোন অ্যাম্বিশান বা ফ্রাসট্রেশানের লক্ষণ এটা......

সুনীথের চোখ তন্দ্রায় জড়িয়ে আসে এবার। ঘুমোতে ঘুমোতেও সে একবার ভাবতে চেষ্টা করল, হয়ত জয়দীপের কথাটাই ঠিক। অপূর্ণ এক বাসনার গুঞ্জন তার বুকের মধ্যে বাজছে সব সময়। কিন্তু জয়দীপের ভিতরের শব্দটা কেমন? সেটা কি...

আর ভাবতে পারে না সে। গভীর ঘুমের মধ্যে তার সব চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে হারিয়ে যায়।

পাঁচ

তার প্রথম সোলো ফ্লাইং করার দিনটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না সুনীথ। প্রায়ই মনে পড়ে সেই আশ্চর্য সকালটার কথা। সেদিন ডিয়ারের কক্‌পিটে সে সম্পূর্ণ একা। সঙ্গে ডেভিড নেই। একটা সর্টি করে তিনি নেমে গেছেন।

মাথার ওপর আলো ঝলসানো ধু-ধু নীল শূন্য। সামনে অর্ধবৃত্তাকার দিগন্ত রেখা, সোনালী, সবুজ। পায়ের নিচেয় ঘরবাড়ি, মাঠঘাট, গাছগাছালিতে একাকার হয়ে থাকা ঝাপসা পৃথিবী। তার মধ্যে দিয়ে ডিয়ার সোজা উড়ে চলেছে, একলা তাকে নিয়ে। এতদিন সে ডিয়ারকে ওড়ালেও ডেভিড সারাক্ষণ তাকে পাহারা দিয়েছেন। কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই—আই হ্যাভ গট দ্য কণ্ট্রোলস্‌, বলে মুহূর্তের মধ্যে শক্ত হাতে সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। কিন্তু এখন ডিয়ার সম্পূর্ণ তার অধিকারে। সীমানাহীন আকাশের বুক চিরে তারই নিয়ন্ত্রণে বাতাস কেটে এগিয়ে চলেছে। গর্বে, আনন্দে, উত্তেজনায় যেন ডিয়ারের ইঞ্জিনের মতোই চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিল তার। খোলা আকাশে মুখ তুলে বলতে ইচ্ছে করছিল—আমি সুনীথ, আমি...আমি... তোমরা দেখ আজ আমি একা আকাশে উড়ছি...

চারদিক থেকে তখন ছুটে আসছে সকালের স্নিগ্ধ সতেজ হাওয়া। প্রপেলারের ঘূর্ণি মাথার ওপর হু-হু ঝড় তুলে তীব্র বেগে বেরিয়ে যায়।

অথচ অন্য আর পাঁচটা দিনের মতোই সেদিন শুরু হয়েছিল ফ্লাইং। তখন সুনীথ কিছুই বুঝতে পারেনি। ডেভিডের নির্দেশে থ্রটল খুলে যথারীতি গুড়ুক গুড়ুক করে সকালের শিশির-ভেজা ঘাস মাড়িয়ে তারা রানওয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। সকালের আলো ফুটতে তখনো বাকি। কালো রানওয়ের ওপর গড়িয়ে চলেছে গুঁড়ো গুঁড়ো কুয়াশার বল। গাছগাছালির মাথায় ঝাপসা কুয়াশার কুণ্ডলী। হাওয়া নেই। ডোরাকাটা উইণ্ড সক্‌স্‌টা নেতিয়ে যাওয়া হোস পাইপের মতো ঝুলছে।

কক্‌পিটে বসে চারদিকে কুয়াশার ভাবটা দেখে খুব বিরক্ত হয়েছিলেন ডেভিড। একটা অশ্লীল গালাগাল উচ্চারণ করেছিলেন আকাশের দিকে

তাকিয়ে। তাকে ডেকে বললেন—দৃষ্টিটাকে খুব তীক্ষ্ম রেখো সানিথ, এই বিশ্রী ঘোলাটে ভাবটা ভাল নয়—যদিও বেশিক্ষণ এটা থাকবে না, তাহলেও সাবধান।

মেশিনটাকে ওড়াবার জন্যে প্রস্তুত করে সে দেখল ডেভিডের আন্দাজে ভুল হয়নি। পাতলা কুয়াশার চাদরটা ইতিমধ্যেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে গুটিয়ে যেতে শুরু করেছে। মসৃণ কালো রানওয়েটার পিঠ জেগে উঠছে সামনে। যতদূর চোখ যায়, সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে কণ্ট্রোল টাওয়ারের দিকে তাকাল সুনীথ। চিড়িক চিড়িক করে অলডিস্ ল্যাম্পের সবুজ সংকেত দেখাল কণ্ট্রোল। সঙ্গে সঙ্গে পুরো থ্রটল খুলে স্টিক বাড়িয়ে দেয় সে। বাঘের মতো গর্জন করে ছুটতে থাকে ডিয়ার। খানিকটা ছোটার পরই আলতো হাতের টানে ভেসে পড়ল তারা।

রানওয়ে ছাড়িয়ে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পেঁছে সে বাঁ দিকে টার্ন নিল। বিশ্রী একটা ঝাঁকুনি খেয়ে একবার নিচের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেশিনটা। বুকের মধ্যে হালকা সিরসিরে অনুভূতি। হাওয়াহীন কোন শূন্য গহ্বরের মধ্যে পড়েছে ডিয়ার। অলটিমিটার দেখে আবার নির্দিষ্ট উচ্চতায় ফিরিয়ে আনে প্লেনটাকে। ডেভিড নির্বাক দর্শকের মতো সব কিছু লক্ষ করছেন। সঠিক উচ্চতায় পেঁছে দিগন্তরেখায় মুখ রেখে সোজা চলল সে।

ডান দিকের আকাশ ফেটে তখন রক্তের মতো রঙ ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীতে।

একটা পাক ঘুরেই আবার নিয়ম মতো নেমে আসার পালা। সবুজ ঘাসের মধ্যে থেকে কালো ফিতের মতো রানওয়েটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। তার ওপর শান্ত পাখির মতো বসে পড়ল ডিয়ার। একটুও লাফাল না, বেঁকল না, মসৃণ ভঙ্গিতে ছুটে চলল সামনের দিকে।

এবার প্লেনটা থামিয়ে আবার টেক অফ করবে সে। এমন সময় কানের মধ্যে গমগম করে বেজে উঠল ডেভিডের গলা—সানিথ, উইল য়ু বি এব্‌ল টু ফ্লাই সোলো টু ডে? তুমি কি এবার একলা আকাশে উড়তে পারবে সানিথ?

সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন প্রতিধ্বনি করে বেজে উঠল সেই প্রশ্ন। বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা ঢেউ ফাটিয়ে দিল কেউ। সে চিৎকার করে বলে ওঠে—ইয়েস সার, আই'ম রেডি টু গো—।

ডেভিড হারনেস খুলে বেরিয়ে এলেন কক্‌পিট থেকে। তার পিঠে হাত রেখে বললেন—গুড লাক, মাই বয়। তারপর দ্রুত পায়ে রানওয়ে ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কণ্ট্রোল টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে রিখি ক্যাপটেন গোয়েলের সঙ্গে গল্প করছিলেন। ডেভিডকে নামতে দেখেই ব্যাপারটা আন্দাজ করে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর মাথার ওপর দু'হাত তুলে নাড়তে নাড়তে সুনীথকে তার প্রথম সোলো পাওয়ার অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। বুড়ো আঙুল উঁচু করে সৌভাগ্য এবং নিরাপদ যাত্রারও ইঙ্গিত দেখালেন কয়েকবার।

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সমর। হেলমেট হাতে ওড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। কালভার্টের ওপর ছটুলাল, টাইম-কীপার সুলতান। সবার চোখ এখন তার দিকে। আবার ঝলকে ঝলকে সবুজ আলো ঝলসে উঠল কণ্ট্রোল টাওয়ারের মাথা থেকে। নিশ্বাস বন্ধ করে হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় সামনের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে হুঙ্কার দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে ডিয়ার। পরক্ষণেই সে শূন্যে ভেসে পড়ল।

মাটিতে নেমে এবার প্লেন থেকে বেরিয়ে আসতেই ডেভিড ছুটে এসে আচমকা এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন কাঁধে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আর একটা। সে পাশ কাটিয়ে সরে যেতে চায়। ডেভিড এবার ঝপ করে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। তাঁর মুখে এক গাল হাসি—কোথায় পালাবে সানিথ? তোমার মাথায় আজ এক ডজন বীয়ার ফাটাবো আমি। ওয়েল ডান বয়, ওয়ানডারফুল পারফরম্যানস। এই ওয়েদারে তোমাকে আজ ছাড়তে আমার একটু দ্বিধা ছিল, কিন্তু এখন দেখছি আমি একটুও ভুল করিনি। সাবাস সানিথ! আভি পার্টি লাগাও, এ গ্র্যান্ড পার্টি।

তার শরীরটা ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আরও খানিকক্ষণ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে চললেন তিনি। আবেগের তোড়ে মাঝে মাঝে মুখ থেকে থুতু ছিটকে আসে। কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। সুনীথ নড়তে পারছিল না। ডেভিডের এই উগ্র অভিনন্দনে সে প্রায় অভিভূত। তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাস, আলিঙ্গন, আঘাত, এমনকি কথার তোড়ে মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়া তরল পদার্থের কণাগুলোও এক সজীব উষ্ণতায় ভরা।

তার পিঠে আরও কয়েকটা চাপড় দিয়ে এবার তিনি সমরকে ডাকলেন—কাম অন সামার।

সোলো পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সেও অপেক্ষা করছে দু-তিন দিন। এবার হয়ত তার ভাগ্য পরীক্ষা।

যাবার সময় সমর তার কানের কাছে দ্রুত একটা চুমু খাওয়ার শব্দ করে

বলে উঠল—টপ খেল্ দেখালে গুরু।

মুচকি হেসে জবাব দেয় সুনীথ—তুইও দেখা এবার। সোলো না পাওয়া পর্যন্ত আজ কোনমতেই মেশিন ছাড়বি না শালা!

কালভার্টের ওপাশে দাঁড়িয়ে রিখি তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফরসা ঘাড়ের ওপর চিকচিক করছে একটা সোনালী ক্লিপ। চোখমুখ হাসিতে উজ্জ্বল। ক্যাপটেন গোয়েল তখনো তাকে কী যেন বোঝাচ্ছেন। কিন্তু রিখির সেদিকে খেয়াল নেই। সে মাঠ ছেড়ে ওপরে আসতেই তিনি এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন—কনগ্রাচুলেশানস্, সানিথ! আই'ম সো গ্লাড। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে আজ!

—থ্যাংক য়ু ম্যাডাম। সুনীথ তাঁর হাতের চাপ অনুভব করে একটু সংকুচিত হয়ে যায়।

রিখির চোখেমুখে এক অদ্ভুত সারল্য—আমি কিন্তু জানতাম, তুমি দু'-একদিনের মধ্যেই সোলো পাবে, তোমাকে ইচ্ছে করেই সেটা বলিনি।

সুনীথ মৃদু হেসে বলে—আমিও কিছুটা আন্দাজ করেছিলাম।

সিগারেট ঠোঁটে গুঁজে সে মাথা থেকে হেলমেটটা খুলে নেয়। কথা বলার সময় অদ্ভুত ভঙ্গিতে সিগারেটটা নড়তে থাকে তার ঠোঁটের মধ্যে। ধোঁয়ার ঝাপটায় একটা চোখ বুজে আসে। রিখি তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন—রিয়েলি, তোমাকে আজ একজন হীরোর মতো লাগছে সানিথ।

ডিয়ারের ইঞ্জিন আবার গর্জন করে উঠল ওদিকে। সমর টেক অফ করছে! রানওয়ে পরিষ্কার হতেই গোয়েল সাহেব এবার তাঁর প্লেনটা নিয়ে উড়তে চললেন। কোথায় যেন ক্রস কান্ট্রি ফ্লাইং-এ যাবেন তিনি। ভারি সুন্দর দেখতে তাঁর কোম্পানীর এই প্লেনখানা। রিখি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর টেক অফ লক্ষ করেন।

বকের মতো সাদা প্লেনখানা আকাশে মিলিয়ে যেতেই আবার তাকে দেখলেন রিখি—সানিথ, একলা আকাশে উঠতে পেয়ে আজ তোমার কেমন লাগছিল। নিঃসঙ্গ লাগে, নাকি খুব গর্ব হয় মনে মনে?

সুনীথ হাসল—কী জানি? ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই তো আমার সর্টি শেষ হয়ে গেল।

পর পর দুটো ল্যান্ডিং দেখে সেদিন সমরকেও সোলো ছাড়লেন ডেভিড। দেখতে দেখতে উজ্জ্বল রোদে ভরে উঠল গোটা রানওয়েটা। একের পর এক

দ্‌জনকে সোলো করিয়ে ডেভিডের মেজাজও খুশিতে ভরপুর। সমরের পলকা শরীরটা এক থাবায় প্রায় শূন্যে তুলে আবার ছেড়ে দিয়ে বললেন—কি'উ বাদশা পাইলট বন গিয়া না আজ? ঘাসের ওপর গড়াগড়ি খায় সমর। সুনীথকে বললেন—কি, খুশি তো সানিথ? এখন দুজনে মিলে একটা পার্টি লাগাও। জলদি!

একটু বিব্রত বোধ করে সুনীথ। প্রস্তুত হয়ে আসেনি আজ। সব মিলিয়ে তাদের দু'জনের কাছে একুশ টাকার মতো আছে। অথচ তখন ক্লাবের সবাইকে ধরলে প্রায় আঠারোজন লোক। এয়ারফোর্সের কেউ আসেনি এখনো। দু'-একজন এসেও যেতে পারে। জয়দীপ জোড়হাটে, তারও ফেরার কথা আজ-কালের মধ্যে। সামান্য কিছু খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেলেও আরও অন্তত গোটা পঞ্চাশেক টাকা দরকার। আজকের বদলে বরং তৈরি হয়ে অন্য একদিন ভাল করে পার্টিটা দেওয়া যেতে পারে। সংকোচের সঙ্গে চুপি চুপি ডেভিডকে কথাটা বলতেই তিনি তেড়ে এলেন—আজ সোলো, কাল পার্টি! অ্যায়সা কভি শুনা হ্যায়? বুদ্ধু কাহাঁকা! লো, আমি দিচ্ছি রুপেয়া।

ওয়ালেট থেকে গুনে গুনে ছ'খানা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন—টেক ইট, অ্যান্ড হারি আপ।

মাসুদ আর মকবুল দ্রুত সাজগোজ করে সাজিয়ে ফেলল ক্যান্টিনটা। এসব ব্যাপারে হেড কুক মোতিও খুব রপ্ত। শরীফ মেজাজে ঝটাপট ডিম ভেজে, স্যালাড বানিয়ে সুন্দর নকশাকাটা প্লেটগুলো সাজিয়ে ফেলতে লাগল। ছটুলাল এক দৌড়ে বাজার থেকে মিষ্টি কিনে আনল এক বাক্স। সবার জন্যে এক প্লেট ছোটা হাজারী, মিষ্টি, কফি, স্ন্যাকস্‌। ফ্লাইং চলতে থাকলে সকালবেলায় বীয়ার বা অ্যালকোহল স্পর্শ করেন না ইনস্‌ট্রাকটাররা। সেটা বাদ দেওয়া গেল। যদিও ক্লাবের সব পার্টিতে সেটাই আসল আইটেম। তবে সে-সব পার্টি বসে সন্ধ্যের পর।

মিঃ চৌধুরী জয়ন্তকে নিয়ে ফ্লাইং-এ যাবেন। দু'হাতে গোঁফের ডগা মুচড়ে তিনিই সবার আগে উঠে দাঁড়ালেন। জলপাই রঙের টিউনিকে ঢাকা বিশাল কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে বললেন—ওয়েল, ইনস্‌ট্রাকটার হিসেবে এবং পাইলট হিসেবে এই দিনগুলো আমাদের কাছে খুব আনন্দের। শিক্ষার্থীদের এই সার্থকতা আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

সুনীথ এবং সমরের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনাদের দু'জনকেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আপনাদের এই আনন্দ এবং গর্বের মুহূর্ত আমাকেও ভরিয়ে তুলছে। ধন্যবাদ স্কোয়াড্রন লীডার ডেভিডকে, কারণ এই সবকিছুর মূলে

রয়েছে তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টি।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন মিঃ চৌধুরী। বেশ একটা গাম্ভীর্যের পরিবেশ এনে দিয়েছেন তিনি ঘরের মধ্যে। ডেভিডের দিকে তাকাতেই তিনি হাততালি দিয়ে আরও সরগরম করে দিতে চাইলেন পরিবেশটা। মিঃ চৌধুরী এবার তাদের জন্যে একটি উত্তেজনাময় এবং নির্বিঘ্ন ফ্লাইং কেরিয়ারের কামনা করে জলের গ্লাসটা শূন্যে তুলে ধরলেন।

ডেভিড চেঁচিয়ে উঠলেন—চাউড্রি, ওটা হুইস্কি নয়। একেবারে স্রেফ সাদা জল। রঙ নেই, নেশা নেই, ও বস্তু দিয়ে উইশ করে কি তুমি থ্রিল পাবে?

মিঃ চৌধুরী হেসে বললেন—আপাতত আমার এতেই চলবে, ফ্লাইং-এ যাচ্ছি। ও ব্যাপারটার জন্যে তোমার মতো পাকা লোক তো রইল।

জয়ন্তকে নিয়ে মিঃ চৌধুরী বেরিয়ে গেলেন। ক্যাপটেন মৈত্রর টেস্ট ফ্লাইং। তিনিও তাদের অভিনন্দন জানিয়ে উঠে পড়লেন। ডেভিড বললেন—গানা চাই এবার, নাহলে জমে না। দাশগুপ্তা, এবার তোমার পালা। দাশগুপ্তর গান-বাজনার চর্চা আছে। সে বাংলা গান গাইল একটা।

সুনীথ রিখিকে অনুরোধ করে—আজ আপনার গান শুনব একটা। রিখি মাথা নাড়েন। সবাই মিলে রিখিকে ঘিরে ধরে—প্লীজ ম্যাডাম, প্লীজ!

ডেভিডও চোখ টিপে বলেন—প্লীজ, প্লীজ! রিখি হাসতে হাসতে সুর করে দু'-তিন লাইন গেয়েই থেমে যান। আর এক দফা হাততালিতে ভরে যায় ঘরটা।

সমর ডেভিডকে বলল—স্যার, আপনি কিছু বলুন এবার।

—আমি? তাহলে হাফ ডজন বিয়ার নিয়ে এস, আমি একখানা ক্ল্যাসিকাল শুনিয়ে দিচ্ছি।

সুনীথ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আই'ম সরি সার, আমারই ভুল হয়ে গেছে। মোতিকে দুটো বোতল আনতে বলে সে।

রিখি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। এবার বাধা দিয়ে উঠলেন—নো নো, স্টপ ইট। ডেভিডের দিকে তাকিয়ে বললেন—ডোণ্ট বী সিলি ডেভ, এই সকালবেলায় তুমি ড্রিংকস্ নিয়ে বসবে না।

ডেভিড হাসলেন—আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু ড্রিংকস্ না হলে আমার যে পার্টি মুড আসে না—অ্যাণ্ড য়ু নো দ্যাট।

—বেশ তো, তার জন্যে না হয় সন্ধ্যেবেলায় একটা ড্রিংকস্ সেশান হোক। তুমিই ব্যবস্থা করো সেটার।

—আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন, আমি বেচারা একজন পুয়োর

ফ্যামিলি ম্যান!

রিখি হাসলেন চোখ টিপে—রিয়েলি? ঠিক আছে, আমিই দেব সেই পার্টিটা। সুনীথের দিকে ফিরে বললেন—তোমরা দু'জন ফ্রি আছ তো আজ?

সুনীথ সম্মতি জানায়।

ডেভিড লাফিয়ে উঠলেন—থ্রি চিয়ার্স ফর মাই প্রেটি ওয়াইফ। হিপ হিপ—

সন্ধ্যেবেলায় এয়ারফোর্স মেসে ডিনারের নিমন্ত্রণ করলেন রিখি। ওরা ধন্যবাদ জানায় তাঁকে। তারপর আর কিছুক্ষণ গল্পগুজব হল। ডেভিডই ঠাট্টা রসিকতায় মাতিয়ে রাখলেন আসরটা। পরে এক সময় দাশগুপ্তকে বললেন—চল এবার একটা সর্টি করে আসি। আকাশে উঠে তোমার গানা শুনি কিছুক্ষণ।

ডেভিডের কথা শুনে দাশগুপ্ত হেলমেট হাতে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। রিখি গাড়ি নিয়ে শহরের দিকে যাবেন। সুনীথের দিকে ফিরে বললেন—যাবে নাকি তোমরা? সুনীথ, সমর দু'জনেই উঠে বসে গাড়িতে।

ছয়

এয়ারফোর্স অফিসার্স মেস। সুন্দর সাজানো ক্লাব। লবি, লাউঞ্জ, গার্ডেন। ডাইনিং হল, বার, গান-বাজনার উঁচু ডায়াস, নাচের জন্যে মসৃণ মেঝে। সুন্দর ঝলমলে পর্দা, পুরু কার্পেট, নানা রঙের মৃদু আলো। স্টিরিওতে বাজনার সুর। হঠাৎ বাইরে থেকে এখানে এলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। সুন্দর পোশাকপরা স্মার্ট চেহারার যুবকেরা গর্বিত ভঙ্গিতে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। কারো হাতে রঙিন পানীয়, কারো হাতে বীয়ারের মাগ।

লাউঞ্জে সোফায় এলিয়ে সিগারেট টানতে টানতে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে কেউ। একদিকে বিলিয়ার্ড বোর্ড ঘিরে একদল পুরুষ ও মহিলা। দাবা নিয়ে প্রবীণ এক অফিসারের মুখোমুখি বসেছে একজন জুনিয়ার অফিসার। তাঁদের আশেপাশে আরও কয়েকজন। বার কাউণ্টারের সামনে উঁচু উঁচু রিভলবিং টুল। সেখানেও দেখা যাচ্ছে বেশ জটলা। বাইরে লবির দু'পাশে গাছ লতাপাতার ঝাড় বসিয়ে তৈরী এক কৃত্রিম উদ্যান। সেখান থেকে ভেসে আসছে একদল মেয়ে ও পুরুষের সম্মিলিত হাসির শব্দ। দু'-একজন আবার ফ্যামিলি কর্নারে তাদের পুরো পরিবার নিয়ে জমিয়ে উপভোগ করছেন সন্ধ্যেটা। সব মিলিয়ে পান, ভোজন, নাচ, গান, খেলা ও আনন্দের এক অদ্ভুত মাদকতাপূর্ণ আকর্ষণ ছড়ানো চারদিকে।

প্রতি মুহূর্তে বিপদ আর দুর্যোগের মুখোমুখি দুঃসাহসিক জীবনের জন্যে বুঝি এইরকম একটা ঝলমলে আকর্ষণ খুবই জরুরি। দিনভর আকাশে ওড়া পরিশ্রান্ত মানুষের দল এই বিলাস ও আরামের অবকাশটুকু যেন মত্ত হয়ে উপভোগ করতে চায়।

সুনীথ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সমরকে আর একবার সাবধান করল—বেশি টানবি না কিন্তু, আউট হলে একেবারে নর্দমায় ফেলে যাব। সমর হাসল। দু'-একবার এ ব্যাপারে কেলেঙ্কারী করার রেকর্ড আছে তার। সে বলল—একটু সামাল দিয়ো গুরু, আমার সতীত্ব এখন তোমার হাতে। রাখবার হলে রেখো, নষ্ট করার হলে কোরো।

সুনীথ কনুই দিয়ে ওর পাঁজরায় গুঁতো মারে—এই ব্যাটা, পেটে না

পড়তেই শুরু করলি। মিসেস ডেভিড সঙ্গে আছেন আজ, সেটা খেয়াল রাখিস।

কোণের দিকে একটা ফ্যামিলি কর্নারে বসেছিলেন রিখি আর ডেভিড। ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন স্কোয়াড্রন লীডার মূর্তি আর তাঁর মিসেস। মূর্তিও ডেভিডের মতো খুব আমুদে মানুষ। কী একটা রসিকতায় দুজনেই হাসছেন খুব। একটু পরে মূর্তি মিসেসের কোমর জড়িয়ে জুনিয়ার অফিসারদের দলে ভিড়লেন। হই হই করে তাদের দল তাঁকে ঘিরে ধরল।

সুনীথ এবার আস্তে আস্তে গিয়ে ডেভিডের সামনে দাঁড়ায়। অ্যাটেনশান হয়ে উইশ করে—গুড ইভনিং সার, গুড ইভনিং ম্যাডাম।

—গুড ইভনিং। সিট ডাউন বয়েজ।

ডেভিড হাত দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করেন।

রিখি হাসলেন—তোমরা কিন্তু অনেক লেট করে ফেলেছ। মৃদু লাল আলোয় তার মুখটা রঙিন। হাসতে হাসতে বলেন—তোমরা কি ড্রিংক করবে বলো?

সমর আড়চোখে সুনীথের দিকে দেখল। সুনীথ একটু ইতস্তত করে। ডেভিড বললেন—টেক বীয়ার. সেটাই সবচেয়ে ভাল।

তিনজনের জন্যে বীয়ার নিয়ে এল ওয়েটার। রিখি তাঁর জন্যে লেমন স্কোয়াসের সঙ্গে জিন অর্ডার দিলেন। গ্লাসে বীয়ার ঢেলে ডেভিড বললেন—চিয়ার্স বয়েজ, উজ্জ্বল এবং উত্তেজনাপূর্ণ হোক তোমাদের কেরিয়ার!

রিখিও তাঁর গ্লাস বাড়িয়ে ধরলেন সামনের দিকে—এবং নিরাপদ হোক তোমাদের জীবন!

প্রথম কিছুক্ষণ খুব শান্তভাবে ড্রিংক করে চললেন ডেভিড। বেশ খুশি মেজাজে গল্প জুড়ে দিলেন। তাঁদের সময়কার এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমির মজার মজার সব গল্প।

কী দারুণ র‍্যাগিং হতো তখন! আজকাল তো উঠেই যাচ্ছে সব। অ্যাকাডেমিতে যাওয়ার সময় সঙ্গে খুব বড় একটা কালো ট্রাঙ্ক নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ইচ্ছে করেই বেশ বড়সড় দেখে এটা কিনেছিলেন। তখন তো আর জানতেন না যে, পরে এটাই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়াবে।

প্রথম দিন জিনিসপত্র নিয়ে অ্যাকাডেমিতে পৌঁছতেই সিনিয়ার ছেলেরা ভিড় করে রিসিভ করতে এল তাঁকে। একজন হঠাৎ বাক্সটা দেখিয়ে বলল—এটা কী হে ছোকরা?

ডেভিড উত্তর দিলেন—কেন সার? এটা আমার ট্রাঙ্ক।

ভেংচি কেটে গালাগালির বৃষ্টি শুরু করে দিল ছেলেটা—ব্লাডি, বাস্টার্ড, ফুল—এটা ট্রাঙ্ক? একে ট্রাঙ্ক বলে কেউ? এটা কফিন, আমি বলছি এটা তোমার কফিন, তোমাকে আজ শুতে হবে এর মধ্যে।

—ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে হুকুম মতো কাজ। সেই সন্ধ্যেবেলায় বাক্স থেকে জামাকাপড় সব বার করে, আমাকে পাঁজাকোলা করে শুইয়ে দিল তার মধ্যে। তারপর গোল হয়ে তারা পাহারা দিতে লাগল।

সিগারেট ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা হাতে নিয়েই গল্প করছিলেন ডেভিড। কাঠিটা পুড়ে আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই হাত নাচিয়ে আফসোস করতে লাগলেন —আজকাল আর তেমন র‍্যাগিং নেই। অনেকেই এর বিরুদ্ধে বলছে। কিন্তু এর একটা ভাল দিকও আছে। মনের দিক থেকে ছেলেদের দারুণ ফ্রী আর টাফ করে দেয় এটা। তাছাড়া আজ যারা তোমায় টীজ করছে, কাল তারাই হবে তোমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই প্রথম ধাক্কাটা খাওয়ার পরই কিন্তু বন্ধুত্বটা জমে ভাল।

—তারপর ভাটকল বলে সাধু সাধু চেহারার একটি মারাঠি ছেলে—

বলতে বলতে হঠাৎ থামলেন ডেভিড। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন —লেট ভাটকল! সে আজ আর নেই আমাদের মধ্যে।

মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশটা কেমন থমথমে হয়ে যায়। রিখির গলাটা কেঁপে ওঠে—কী হয়েছিল তার?

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে রিখির দিকে তাকালেন ডেভিড। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—ভ্যাম্পায়ার নিয়ে ক্র্যাশ করেছিল জম্মুতে। কথাটা বলে একটুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন।

দুটো বোতল দ্রুত শেষ হয়ে গেল তাঁর। তৃতীয়টাও প্রায় খালি। সমরও সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে তাঁর সঙ্গে।

একটু হেসে আবার প্রসঙ্গটা শুরু করেন ডেভিড—সেই ভাটকল, বুঝলে, আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল, 'এই, তোমার ক'জন গার্ল ফ্রেন্ড আছে?'

আমি বললাম—সরি সার, এখনো একজনও জোগাড় করতে পারিনি।

—'ঠিক আছে, আফসোস করো না, এখানে বিস্তর পাওয়া যায়।' চাবির রিঙ ঘোরাতে ঘোরাতে সে বলল।

—সত্যিই? ধন্যবাদ সার।

—'এখানে প্রচুর উট ঘুরে বেড়ায়, দেখনি?'

নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম—দেখেছি সার, এখানে কি সেই উটের সঙ্গে প্রেম করে সবাই?

ভাটকল সপাং করে চাবির চেন দিয়ে মারল—'বাগার, ফুল, উটের সঙ্গে ভালবাসা করবে কেন? সেগুলোয় চেপে আশপাশের ভিলেজে যেতে হয় সেজন্যে, বুঝলে?'

বলতে বলতে টেবিল কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন ডেভিড। সমরও প্রায় গড়িয়ে যায় সোফার ওপর। রিখি হাসতে হাসতে বললেন—ডেভ, স্টপ ইয়োর স্টোরিজ।

রেকর্ডে নাচের বাজনা বাজছে। দাবা খেলার আসরে এখন অনেক ভিড়। দু'-একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনার তালে তালে শরীরটা দোলাচ্ছে। বাইরের বাগান থেকে একজন শিস দিয়ে বাজনার সুরটা নকল করে। ডেভিডের পানের মাত্রা বেড়ে যায় ক্রমশ। রিখি বাধা দিলে কেবল বলেন—এইটে লাস্ট।

ডিনার সার্ভ করে গেল বেয়ারা। চিকেন চাওমিং ফ্রাই, সুপ, সুইট। ডেভিড প্রায় কিছুই খেতে পারলেন না। হাতে ধরা সিগারেটের লম্বা ছাইটা ভেঙে নিজের প্লেটেই পড়ল। সমরও ঠিক মতো সোজা হয়ে বসতে পারছিল না। একবার টলতে টলতে উঠে বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ পরে ফিরল। কে জানে, বমি করে এল কিনা খাবারটা। সুনীথ তার দ্বিতীয় বোতলের সবটা শেষ করতে পারে না। রিখি বাধা দিলেন—ডোণ্ট টেক টু মাচ সানিথ। সে গ্লাসটা সরিয়ে রাখে।

কিন্তু ডেভিডকে সামলাবে কে? মুখের চেহারা পাল্টে গেছে তাঁর। আরও নেশার জন্যে উঠে পড়লেন তিনি। রিখি আপত্তি করতে লাগলেন—নো ডেভ, আর নয়। ডেভিড হাসলেন। তারপর আচমকা রিখিকে একটা চুমু দিয়ে বললেন—জাস্ট এ ফিউ সিপ্স্ ডার্লিং। রিখি লজ্জায় লাল হয়ে মুখটা নামিয়ে নিলেন।

বার কাউণ্টারের সামনে তখন রীতিমতো হুল্লোড়। স্কোয়াড্রন লীডার মূর্তি, ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট সহায় একে একে অনেকেই তখন জুনিয়ার অফিসারদের সঙ্গে বসে পড়েছেন। বার সার্ভিস বন্ধ হবার আগে চুটিয়ে শেষ দফার পান চলেছে তখন। ডেভিড টলতে টলতে ওদের মধ্যে গিয়ে বসলেন।

রিখি নিশ্বাস ফেলে বললেন—দেখলে তো, এই ভয়ই আমি পাচ্ছিলাম! একেবারে আউট না হওয়া পর্যন্ত যেন ওর স্বস্তি নেই। কোন একটা উপলক্ষ পেলেই ও এই রকম করবে। আজ আর ওকে আটকানো যাবে না। তোমরা বরং এবার চলে যাও সানিথ।

রিখির চোখেও পাতলা নেশার প্রলেপ। ছলছলে চোখেমুখে যেন একটা

তন্দ্রার ভাব।

সমর তখন থেকে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে। ঘুমিয়েই পড়ল কিনা কে জানে! রিখি সোফায় হেলান দিয়ে আবার নিশ্বাস ফেললেন—ডেভিডের এই স্বভাবের জন্যেই সব সময় আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে আছি। কিন্তু তবুও সামলাতে পারি না। কোন ব্যাপারেই যেন অল্পেতে খুশি হয় না ও। সব সময় একটা বড় রকমের উত্তেজনা চাই। সে ফ্যামিলি লাইফেই হোক, এয়ারক্র্যাফট নিয়েই হোক বা ড্রিংকস্ নিয়েই হোক। এতটা বেহিসেবী উদ্দামতা কখনোই ভাল নয়। বিশেষত পাইলটদের পক্ষে তো নয়ই।

সুনীথ চুপচাপ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। সে বুঝতে পারে না, এ ব্যাপারে তার কিছু বলা উচিত কিনা। খুব বিষণ্ণ একটা দৃষ্টি রিখির চোখে। কিছুক্ষণ সোজা তাকিয়ে থেকে আবার বলে উঠলেন—এমনিতে দেখ, পাইলট হিসেবে ওর কী সুনাম। ইনস্ট্রাকটার হিসেবেও দেখেছি ছেলেরা ওকে বরাবর ভীষণ ভালবাসে। সেসব দিকে ওর বিচারবুদ্ধি বা দায়িত্বজ্ঞান সম্পূর্ণ সজাগ। কিন্তু অ্যালকোহল পেলেই ও কেন যে এমন হয়ে যায়! একেবারে শিকলছাড়া অ্যালসেশিয়ানের মতো লাফাতে শুরু করে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না সানিথ। মনে হয়, এইটাই ওর আসল চেহারা। জীবনটাকে হয়ত এইভাবেই পেতে চায় ডেভিড।

রিখি আবার বললেন—তুমি চলে যাও সানিথ, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো না।

বিদায় নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। সমরকে টেনে তুলতেই সে ফ্যালফ্যাল করে একবার চারদিক দেখল। কিন্তু পরক্ষণেই খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে লাগল। যেন কিছুই হয়নি তার। নিজেকে বেশ সুন্দরভাবে সামলে নিল। স্মার্ট ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে বিদায় নিল রিখির কাছে—ধন্যবাদ ম্যাডাম, এই সুন্দর সন্ধ্যেটার জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, অ্যান্ড গুড নাইট।

রিখি ওর ফর্মালিটি বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা দেখে হেসে ফেললেন —গুড বাই অ্যান্ড হ্যাভ এ গুড শ্লীপ। তাঁর ঝকঝকে সুন্দর দাঁতগুলো একবার ঝিলিক দিয়ে উঠল।

সেদিন রাত্তিরে ডেভিডকে অনেকক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখল সুনীথ। অচেনা একটা এয়ারক্র্যাফট নিয়ে তারা দু'জনে কোথায় উড়ে চলেছে। হঠাৎ প্রচন্ড ঝড় উঠল আকাশে। চারিদিকে অন্ধকার। ডেভিড বলছেন—সানিথ, কুইক,

এক্ষুনি ফোর্স ল্যান্ড করতে হবে আমাদের। কিন্তু কোথায় নামবে তারা? নিচেয় তো শুধু ঘন জঙ্গল আর জলা মাঠ। সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ডেভিড সমানে চেঁচাচ্ছেন—য়ু মাস্ট ল্যান্ড হিয়ার, য়ু মাস্ট! বলতে বলতে নিজেই কন্ট্রোল টেনে নিয়ে সেই জঙ্গলের দিকে নামতে লাগলেন। একটা দারুণ আতঙ্ক আর উত্তেজনার মধ্যে তার ঘুম ভেঙে যায় অবশেষে।

সাত

এর দু'দিন পরই আবার ডেভিডের অন্য এক চেহারা দেখেছিল সুনীথ।

সকালবেলায় মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি গুপ্ত আর হারীতকে ডাবল মার্ক টাইম করাচ্ছেন। তালে তালে পা ফেলে শারীরিক কসরত চলছে ওদের। ডেভিডেব ধারণা গুপ্তর হাতেপায়ে চলাফেরায় কোথাও একটা জড়তা আছে। ফ্লাইং-এর সময় ও কক্‌পিটের মধ্যে কাঠ হয়ে বসে থাকে। আর হারীতের আছে নার্ভাস-নেস। দু'জনের জন্যেই তাই এই ব্যবস্থা।

লেফট রাইট করে সমানে দু'পায়ের ওপরে নেচে চলেছে ওরা। সঙ্গে ডেভিডও লাফাচ্ছেন। এই সকালবেলাতেই ঘামছেন দরদর করে। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই। ওদের আরও উৎসাহ দেবার জন্যে সমানে চেঁচাচ্ছেন—আপ, আপ, আরও উঁচুতে তোল হাঁটু, একেবারে পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে দাও—কাম অন গুপ্তা, য়ু আর নট এ প্রেগন্যান্ট লেডী।

বলে নিজেই হাঁটু মুড়ে পেটের সঙ্গে লাগিয়ে দেখাচ্ছেন। যেন এসব ব্যাপারে কোন কষ্ট নেই তাঁর। হাসছেন হা হা করে।

ওদিকে কন্ট্রোল টাওয়ারের কাছে গোয়েল সাহেব দাঁড়িয়ে। সঙ্গে তাঁর গার্ল ফ্রেন্ড জেফ্রি। এই নামেই তিনি জেফ্রিকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। গোয়েলের প্লেনে তেল ভরা হচ্ছে। ওটা শেষ হলেই তিনি তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে আকাশ বিহারে যাবেন। জেফ্রির সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ চৌধুরী। পাইপ টানছেন আর ঘন ঘন গোঁফ পাকাচ্ছেন। তাঁর কথায় শরীর দুলিয়ে মাঝে মাঝে হেসে উঠছে জেফ্রি। মিনি স্কার্ট পরা ধবধবে মসৃণ শরীর। নিটোল অনাবৃত উরু। সকালের উজ্জ্বল রোদ্দুরে যেন মাছের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে রিখি ওদের দেখছিলেন। গোয়েল তাঁকে ডাকলেন হাত নেড়ে—হাই। রিখি মৃদু হেসে এগিয়ে গেলেন। গোয়েলের প্লেনখানা তাঁর ভীষণ পছন্দ। ওটাতে তাঁকে একদিন জয় রাইড দেবেন গোয়েল, কথা আছে।

গোয়েলের কোম্পানীর প্লেন। ঝকঝকে সাদা রঙের নতুন বোনাঞ্জা। খুব

সুদৃশ্য আর শৌখিন মেশিন। দূর থেকে সুন্দর একটা সামুদ্রিক মাছের মতো লাগে দেখতে। টেক অফের পর বাতাসের সমুদ্রে যেন তীরবেগে সাঁতার কাটে মাছটা।

ডেভিড একদিন গোয়েলের সঙ্গে উড়েছিলেন ওটায়। নেমে এসে বললেন—পাখিটা দেখতে ভাল হলে কি হয়, আকাশে বড় বেশি ছটফট করে। এলোমেলো একটু বাতাস পেলেই লাফিয়ে ওঠে। বলেই মুখ দিয়ে একটা শব্দ করে বোনাঞ্জার উড়ে যাওয়ার গর্জনটা শোনালেন। কক্‌পিটে বসে নাকি মৌমাছির ঝাঁক ওড়ার মতো এই শব্দটা কানে আসে।

—দেখ ঠিক এইরকম, বলে বারবার ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে আওয়াজটা নকল করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

গোয়েল লোকটাকে অবশ্য ডেভিডের তেমন পছন্দ নয়। বলেন—ও ফ্লাইং ভালবাসে না। জীবনে শুধু তিনটে 'ডি' ওর লক্ষ্য। ডেভিডের ভাষায় তিনটে ডি'র ব্যাখ্যা হলঃ ড্রিংকস, ডলার অ্যান্ড ডেমস্‌। অর্থাৎ মদ, মেয়েমানুষ আর টাকা। যার লোভে ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট গোয়েল এয়ারফোর্স ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। ফোর্সে তিনি ডেভিডের চেয়ে সিনিয়ার ছিলেন। কিন্তু সেই রুটিন-বাঁধা জীবনে তার পোষাল না, তাই সময় থাকতেই সরে পড়েছেন।

এখন তিনি মেরিম্যান অ্যান্ড জনসন কোম্পানীর প্রাইভেট পাইলট—ক্যাপটেন গোয়েল। প্রচুর টাকা, গাড়ি, বাংলো, নিরাপদ জীবন আর দেদার অবসর। সুখী হবার সবগুলো সরঞ্জাম তাঁর হাতের মুঠোয়। তবু গোয়েল ঠিক সুখী হতে পারেননি। কোথায় যেন একটা অভাব থেকে গেছে। আফসোস করেন মাঝে মাঝে—কিছুই করতে পারলাম না।

এয়ারফোর্স ছেড়ে এসে বিয়ে করেছিলেন। সেটা স্থায়ী হয়নি। বছর দেড়েকের মাথায় স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

আপাতত তাঁর এই পার্শি বান্ধবীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে আছেন। মাঝে মাঝে তাকে ক্লাবে নিয়ে আসেন। পাশে বসিয়ে আকাশে ওড়েন। বড় বেশি উগ্র সাজগোজ জেফ্রির। যতটা সম্ভব শারীরিক প্রদর্শনীর সাহায্যে সে আশেপাশে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিতে চায়। ফরসা গোল মুখ, ফোলানো ঠোঁট, কটা চোখ দুটোয় কেমন এক নির্বোধ দৃষ্টি। ডেভিডের মতে এমন মেয়েকে নিয়ে আকাশে ওড়া আর সুইসাইড করতে যাওয়া এক কথা। যতটা সম্ভব জেফ্রিকে এড়িয়ে চলেন তিনি।

মেশিন তৈরি হতেই গোয়েল জেফ্রিকে নিয়ে আকাশে উঠলেন। কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে রিখি এক দৃষ্টিতে ওদের প্লেনের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

দেখতে দেখতে পলাশ পাকুড়ের জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে মিলিয়ে গেল এয়ারক্র্যাফটখানা। মিঃ চৌধুরী গেলেন ন্যাভিগেশানে। এল ফাইভ নিয়ে কমারশিয়াল পাইলট প্যাটেলের সঙ্গে। রানওয়েটা খানিকক্ষণের জন্যে আবার ফাঁকা হয়ে পড়ে রইল। দু'পাশে ঘাসের ওপর ফড়িং প্রজাপতির দল হাওয়ার স্রোতে হুটোপাটি করে ভেসে বেড়ায়।

গুপ্ত আর হারীতকে ছেড়ে দিয়ে এবার ডেভিড এসে বললেন—সানিথ, আজ তোমায় ফোর্স ল্যান্ডিং শেখাব। আকাশে উড়তে গেলে এই এমারজেন্সীর জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে চিরদিন। আকাশের বিপদের কথা কেউ আগে থেকে বলতে পারে না; তোমার মেশিন সব সতর্কতা সত্ত্বেও যে কোন মুহূর্তে বিগড়ে যেতে পারে। তখন বাধ্য হয়ে এই পথটা বেছে নিতে হয় পাইলটদের। তোমার জীবন এবং এয়ারক্র্যাফটকে বাঁচানোর এটাই তখন শেষ উপায়। মনে রাখবে, ফ্লাইং লাইফের এটাও কিন্তু একটা অঙ্গ। অ্যান্ড, এ রিয়েল অ্যাডভেঞ্চার।

কেমন একটা আবেগের সঙ্গে বলে যাচ্ছিলেন তিনি। হয়ত পুরোনো কোন ঘটনার কথা মনে পড়ছিল। দু' আঙুলে সিগারেটের শেষ অংশটুকু টোকা দিয়ে আকাশে ছুঁড়ে আবার বললেন—কিন্তু তুমি আর একটু অপেক্ষা করো, আগে উইংকোর সঙ্গে একটা সর্টি সেরে আসি। বলে আড়চোখে গুপ্তর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। উইংকো নামটা তিনিও জেনে ফেলেছেন। গুপ্ত গম্ভীর মুখে তাঁকে অনুসরণ করে।

হাওয়ার অবস্থাটা তেমন ভাল নয় এখন। দমকা বাতাসে উইন্ড সক্‌স্‌টা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। হারীতের বোধ হয় আজ আর ওড়া হল না। প্রথম সোলোর জন্যে আরও ভাল আবহাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হবে তাকে। শুকনো মুখে সে রজনীবাবুর সামনে বসে আছে।

ক্লাবের হেড ক্লার্ক রজনীবাবুকে সবাই জুয়েল মিত্তির বলে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ধুতি আর হাফ শার্ট পরা নিরীহ চেহারার বাঙালীবাবু। ধাঁধানো ঝকঝকে দাঁত। সারাদিন ধরে ফোয়ারার মতো রসিকতা ছুটছে মুখ থেকে। কমারশিয়াল লাইনের সিনিয়র পাইলটরা দেখা হলে বলে—কই জুয়েলদা, নতুন কিছু ছাড়ো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় যত রাজ্যের সরস গল্প।

বহুদিনের পুরোনো লোক। কাউকে বড় একটা তোয়াক্কা করেন না।

ক্যাপটেন গোয়েলকে একদিন একা দেখে বললেন—সাহেব, আজ তোমার জোড়া ইলিশ গেল কোই? তোমারে ছাইর‍্যা গেল নাকি?

গোয়েল খুব ইলিশ মাছের ভক্ত। ক্যাণ্টিনে এসে প্রায়ই ইলিশ মাছের খোঁজ করেন। কিন্তু জুয়েলদার রসিকতাটা তিনি ঠিক ধরতে পারেন না। বলেন—হোয়াট? হোয়াট ইজ দ্যাট?

জুয়েলদা হাসেন মিটি মিটি—আরে সাহেব, তোমার বন্ধুনীর কথা জিগাই। আমরা যেমন ইলশা মাছ দেখলে পাগল, তোমারও পরানডার মধ্যে তো বন্ধুনীর জন্যে তেমন করে, না কি? এতদিন ধরে সেই জোড়া ইলিশের নাচন দেখেও তুমি তারে চিনলা না?

গোয়েল তবুও ঠিকমত বুঝতে পারেন না ইঙ্গিতটা। কিন্তু সবাইকে হাসতে দেখে তিনিও হেসে ফেলেন।

হারীতকেও সম্ভবত কিছু একটা টিপ্পনী কাটছেন জুয়েলদা। এখন সমানে হাসছে সে হো হো করে।

গুপ্তকে নিয়ে খানিকক্ষণ ওড়ার পর ডেভিড নেমে এলেন। সুনীথ হেলমেট হাতে অপেক্ষা করছিল। ডেভিড বললেন—আর একটু সবুর করো, গলাটা ভিজিয়ে নিই। ছট্‌টু, চায় লাও।

চা খেতে খেতে আর একবার তিনি পরিষ্কার ভাবে ফোর্স ল্যাণ্ডিং-এর নিয়মগুলো বুঝিয়ে দেন। রিখি হঠাৎ এগিয়ে এসে বললেন—ডেভ, আমিও কিন্তু উড়তে যাচ্ছি—কিশোরীর মতো আনন্দে উচ্ছ্বসিত তাঁর চোখমুখ—রিয়েলি, আমি ঠাট্টা করছি না!

ডেভিড অবাক হয়ে বলেন—সে কি?

রিখির চোখে চাপা কৌতুক—গেস্‌, বলো দেখি—

ডেভিড হাসলেন—বুঝেছি, গোয়েলের বোনাঞ্জায়—

—ইয়েস, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি যাব তো?

ডেভিড কপাল কুঁচকে বললেন—অফকোর্স তুমি যাবে। কিন্তু একেবারে চলে যেও না যেন গোয়েলের সঙ্গে, তাহলে আমার অবস্থাটা কিন্তু খুবই শোচনীয় হবে।

চোখেমুখে একটা ভর্ৎসনার ভঙ্গি ফুটিয়ে ধমকে উঠলেন রিখি—ডেভ, ডোণ্ট বী সিলি!

এয়ারপোর্ট এলাকা ছেড়ে দূরে একটা মাঠের মধ্যে চলল তার ফোর্স ল্যান্ডিং-এর মহড়া। মাটির কাছাকাছি হাওয়ার স্তরটা বড় বেশি এলোমেলো। ডিয়ারের মুখটা সোজা রাখাই সমস্যা। একটুক্ষণ উড়েই ডেভিড মেশিনটাকে আবার উঁচুতে নিয়ে গেলেন। ওপরের হাওয়াটা শান্ত। মৃদু ঠান্ডা হাওয়া। নিচের পেপার মিল থেকে একটা উৎকট গন্ধ এইখানে এসে আকাশের গায়ে আটকে আছে। তারা আবার বিমান বন্দরের দিকে ফিরে চলল। ডেভিড বললেন—এই গাস্টি উইন্ডের মধ্যে আজ তোমার ল্যান্ডিং দেখব, সানিথ। দেখি, তুমি কেমন ম্যানেজ করতে পার।

সারকিটে ফিরে আসতেই দেখা গেল, গোয়েলের বোনাঞ্জা মাটিতে নামছে। নিঃশব্দে রানওয়ের ওপর বুক লাগিয়ে সোজা ছুটে গেল মেশিনটা। ওপর থেকে একটা সুন্দর খেলনার মতো লাগছে দেখতে। রানওয়ে ছেড়ে আস্তে আস্তে কন্ট্রোল টাওয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এইবার হয়ত রিখিকে জয় রাইড দেবেন গোয়েল।

কন্ট্রোল সবুজ সংকেত দেখাতেই সুনীথ গ্লাইড করে এগিয়ে আসতে শুরু করল। ডেভিড বললেন—তোমার ট্রিমারটা সেট করো দেখি সানিথ, একেবারে নির্ভুল পজিশান হওয়া চাই কিন্তু।

বাঁ দিকে স্প্রিং-এর মতো ট্রিমারটা সরিয়ে সরিয়ে সে ঠিক জায়গাটা অনুভব করতে চেষ্টা করে। অনেকটা দাঁড়িপাল্লায় ওজন ঠিক করার মতো লাগে এই সময়। কাঁটাটা ঠিক জায়গায় ধরাতে পারলে প্লেনটা সরল রেখায় সোজা হয়ে উড়বে, ইচ্ছে করলে কন্ট্রোল স্টিক থেকে তখন হাত সরিয়েও নেওয়া যায়। ডেভিড তাই-ই চাইছিলেন।

বললেন—স্টিক ছেড়ে এইবার হাত তোল ওপরে। সুনীথ চেষ্টা করতেই মুখটা ঝপ করে নেমে যায় ডিয়ারের। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে আরও একটু পিছনে সরিয়ে দেয় ট্রিমারটা। ডেভিড চেঁচালেন—কাম অন, আবার চেষ্টা করো। শো মী ইয়োর হ্যান্ডস। সুনীথ এবার হাত তুলে দেখাল। ডিয়ারের গায়ে চাপড় মেরে ডেভিড বললেন—ভেরী গুড, এইবার রিল্যাক্স করো। তাকিয়ে দেখ চারদিকে।

সুনীথ নিচের দিকে তাকায়। রানওয়ে থেকে তারা এখনো প্রায় পাঁচ-ছশ' ফুট ওপরে। গোয়েলের প্লেনের সামনে একটা ছোটোখাট ভিড়। ওপর থেকে সবাইকে কী ছোট ছোট লাগছে দেখতে! রিখির পরনে নীল ফ্রক। ছটুলালের মাথায় সাদা পাগড়ি। হারীত আর গুপ্ত বোধ হয় বোনাঞ্জাটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এখন। বাঁ দিক থেকে হুড়মুড় করে হাওয়ার ঝাপটা আসে। ডিয়ার

লাইন থেকে সরে যেতে চায় হঠাৎ। রাডারে চাপ বাড়িয়ে সে স্টিকটা সামান্য বেঁকায়।

ডেভিড হঠাৎ বলে উঠলেন—বোনাঞ্জাটা দেখতে পাচ্ছ, সানিথ?

স্পীকারে মুখ লাগিয়ে সে চেঁচাল—ইয়েস সার।

—আশপাশের লোকগুলোকে?

—ইয়েস সার।

—মাই ইয়াং ওয়াইফ রিখি—দেখতে পাচ্ছ তাকে?

—ইয়েস সার, সবাইকে দেখতে পাচ্ছি।

—রিখি কিন্তু খুব সুন্দরী, কি বলো সানিথ?

—ও ইয়েস, শী ইজ ভেরী বিউটিফুল, সার।

—তুমি রিখিকে ভালবাস?

সুনীথ ঘাবড়ে যায় হঠাৎ। একসঙ্গে এলোমেলো অনেকগুলো কথা বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে—ইয়েস সার, নো সার, আমি মানে, ভীষণ পছন্দ করি তাঁকে।

ডেভিড হেসে ওঠেন হা হা করে—ব্লাডি ফুল, কেন, তুমি ভালবাসতে পার না তাকে? সত্যি কথা বলতে ভয় পাও?

দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে যায় সুনীথ। কানের মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন ডেভিড—হেই—কোথায় নামতে চলেছ তুমি?

ডিয়ারের মুখটা এর মধ্যে রানওয়ে থেকে সরে ঘাসের ওপর চলে এসেছে কখন। সে চমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি সোজা করল মেশিনটাকে। তারপর চেক দিয়ে ধীরে ধীরে বসিয়ে দিল রানওয়ের ওপর। সামান্য বাম্প করে সোজা দৌড়তে লাগল মেশিনটা।

—ফাইন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এত ঘাবড়ে গেলে কেন, সানিথ?

আয়নার মধ্যে তাঁর মুখটা দেখছিল সুনীথ। এখনো হাসছেন মিটিমিটি—মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, যতক্ষণ কক্‌পিটে আছ, দিস ইজ ইয়োর ওনলি গার্ল ফ্রেন্ড। তোমার হাত, পা, চোখ, জাজমেণ্ট সবই এই একদিকে রাখতে হবে। যে কোন ঘটনাই ঘটুক না কেন, তুমি তোমার মনোযোগ নষ্ট করতে পার না।

বলতে বলতে আবার হাসলেন। ছেলেমানুষের মতো সরল উদার হাসি। চোখের কোণ দুটো প্রায় বুজে যায়।

ওদিকে রিখি বোনাঞ্জায় ওঠার আগে তাদের লক্ষ করে হাত নাড়ছেন। ডেভিড দেখতে পেয়ে হাত তুললেন আকাশে। বললেন—দেখছ সানিথ, ম্যাডাম কি খুশী আজ। চল আমরাও আর এক চক্কর ঘুরে আসি। স্টার্ট।

থ্রটল বাড়িয়ে দেয় সে। আবার ছুটতে শুরু করে মেশিনটা।

সারকিটে থাকতেই দেখা গেল গোয়েল উঠে আসছেন ওপরে। ডেভিড খুব মনোযোগ দিয়ে ওদের লক্ষ করছিলেন। কী সুন্দর ভঙ্গিতে বোনাঞ্জার সাদা ডানা দুটো ভেসে পড়ল বাতাসে।

সুনীথ সারকিট ছেড়ে দূরে সরে গিয়ে এবার আরও ওপরে উঠতে শুরু করে। হালকা ধরনের টুকরো টুকরো মেঘ ভাসছে আকাশে। হাওয়ায় কাগজকলের সেই তীব্র গন্ধটা। মাথার মধ্যে তখনো এক ঝিমঝিমে অনুভূতি। ডেভিডের উদ্ভট রসিকতাটা ভুলতে পারছিল না। কোন হাওয়াহীন শূন্য গহ্বরের মধ্যে হঠাৎ প্লেন পড়লে যেমন সিরসির করে ওঠে শরীর, তেমনি এক অনুভূতি। তেমনি এক আচমকা ধাক্কা দিয়ে ডেভিড তাকে পরখ করতে চাইলেন। আশ্চর্য! রিখি ঠিকই বলেন—ও একটা পাগল! তাঁর মতো পাগলাটে লোকের পক্ষে সবই সম্ভব। যে কোন ধরনের রসিকতা।

আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে উড়েছিল তারা। তীব্র ঠান্ডা বাতাসের স্রোত। কিন্তু এভাবে চক্কর কেটে শুধু শুধু ওড়ার সময়টাকে বাড়িয়ে নিতে ভাল লাগছিল না সুনীথের। আয়নার মধ্যে ডেভিডের মুখটা লক্ষ করল।

সমানে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আকাশ দেখছেন ডেভিড। কেমন এক অস্থিরতার ভাব চোখেমুখে। সম্ভবত বোনাঞ্জাটাকে দেখতে চেষ্টা করছেন তিনি। কক্‌পিটের মধ্যে তাঁকে কখনো এমন অধৈর্য হয়ে উঠতে দেখেনি সুনীথ। তাঁর মতো অভিজ্ঞ ঝানু পাইলটের পক্ষে এই সামান্য ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তার কারণ থাকতে পারে না। হয়ত গোয়েলের সঙ্গে রিখির ওড়াটাই তাঁর অপছন্দ। এবং সেটা মুখে প্রকাশ করতে পারেননি বলেই এমন একটা চাপা অস্বস্তিতে ছটফট করছেন। ডেভিডের এই চেহারাটা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন।

স্পীকারে মুখ লাগিয়ে সে চিৎকার করে—সার, শ্যাল আই গো ডাউন?

—ইয়েস মাই বয়; এবার আর একটা ভাল ল্যান্ডিং দেখতে চাই—একদম পাক্কা। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিলেন তিনি।

হাওয়াটা আরও খারাপ হয়ে আসছে ক্রমশ। দমকা ক্রস উইন্ড। সক্‌স্‌টা মাঝে মাঝে রানওয়ের আড়াআড়ি সোজা ফুলে উঠছে। ঠিকমত হাওয়া কাটাবার জন্যে প্লেনটাকে একটু কোণাকুণি করে নিতে হয়। তারপর হাওয়ার ঢেউয়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে মোটামুটি পরিচ্ছন্নভাবে নেমে পড়ল সুনীথ।

বেল্ট খুলে কক্‌পিট থেকে নেমে ডেভিডের দিকে তাকাল সে। হয়ত তেমন ভাল হল না তার ল্যান্ডিংটা। কিন্তু ডেভিড হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে পিঠে চাপড় মেরে বললেন—সাবাস সানিথ! ফাইন ল্যান্ডিং! যদি আর

কয়েকবার তুমি এই রকম পারফরম্যানস্ দেখাতে পার, তাহলে আই'ল গিভ মাই ওয়াইফ টু য়ু। নো ব্লাডি গোয়েল, ওনলি য়ু—তুমিই তাকে আকাশে নিয়ে যাবে, রাইট?

বলেই আবার সেই অদ্ভুত হাসি। সুনীথ চমকে তাঁর দিকে তাকায়।

মাঁ-আঁ-আঁ-আঁ—

মাথার ওপর মিঃ চৌধুরীর এল ফাইভ খাড়া হয়ে বাঁক নিচ্ছে। তীব্র শব্দের ঢেউ আছড়ে পড়ছে শূন্যের মধ্যে। প্রবল বাতাসে ঝাপটা দিয়ে শব্দটা যেন সুনীথের কানের মধ্যে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

আট

এই দাদা, দাদা—।

দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে সুধা। অনেক বেলা হয়ে গেলেও সুনীথ চুপচাপ শুয়ে ছিল। অন্য দিনের তুলনায় একটু ঢিমে তালে শুরু হয় রবিবারটা। সবারই একটু দেরিতে ঘুম ভাঙে। অনেকক্ষণ থেকেই তাই সে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

দরজা খুলতেই সুধা চায়ের কাপ নামিয়ে বলল—তুই জেগে আছিস?

—কী মনে হচ্ছে? ভুরু কুঁচকে সুনীথ সুধাকে দেখল।

সদ্য ঘুম থেকে ওঠা ফোলানো চোখ সুধার। অদ্ভুত একটা তৃপ্তির ভাব জড়ানো মুখে। কথাটা শুনে সে সামান্য হাসল। তারপর বিছানার এক পাশে বসে পড়ে বলল—এই, তোর মনে আছে তো, কালই ওরা টিকিট কাটতে যাবে। আজকেই যা হোক একটা কিছু ফাইনাল বলে দিতে হবে আমাকে।

সুধা আলতোভাবে ওর পিঠে হাত রাখে। কোন জবাব না দিয়ে সুনীথ একটা সিগারেট ধরায়।

চৈতীরা এবার দল নিয়ে দিল্লীতে যাচ্ছে ফাংশান করতে। সব মিলিয়ে দশ-পনেরো দিনের প্রোগ্রাম। চৈতী সুধাকে নিয়ে যাবে। এই সুযোগে একবার দিল্লী আগ্রা জয়পুর হয়ে আসবে সে। সুধার ইচ্ছে দাদাও সঙ্গে যাক। মুষড়ে পড়া মন-মেজাজটা যদি ভাল হয় এতে। মা'রও তাই ইচ্ছে। চৈতী নাকি তাদের দু'জনকেই যাবার জন্যে খুব ধরেছে। কথাটা শুনে প্রথমটা কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সুনীথ। চৈতী তাকেও সঙ্গে নিতে চায়? করুণা, নাকি দয়া? ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ব্যাপারটা।

সুধা একটা রহস্যময় হাসির ভঙ্গিতে বলেছিল—ঠিক আছে, বিশ্বাস না হয়, চৈতী তোকে নিজেই এসে বলবে। তাহলে বিশ্বাস হবে তো?

সুনীথ বিব্রত হয়ে বাধা দেয়—না না, সেজন্যে নয়, আসলে আমার এখন কোথাও ইচ্ছে নেই যেতে। তুই বরং ঘুরে আয় ওদের সঙ্গে।

কথাটা তখনকার মতো চাপা পড়লেও সুধা হাল ছাড়েনি। সমানে লেগে আছে পিছনে। চৈতীর ছোট মামা খুব বড় ডাক্তার দিল্লীর। কথা আছে তাঁকে

ধরে একটা থরো চেক-আপের ব্যবস্থাও হবে সুনীথের জন্যে। এটা শোনার পরই আরও খারাপ লাগছে তার। আবার সেই মেডিক্যাল টেস্ট। একটা অনিশ্চিত শব্দকে আঁতিপাঁতি করে আবার তার বুকের মধ্যে খুঁজে বেড়ানো! ভাবতেও ঝিমঝিম করে ওঠে মাথাটা। আসলে এ সবই মা'র প্ল্যান। তিনিই নিশ্চয়ই তলে তলে সুধাকে দিয়ে এসব করাচ্ছেন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে সে বলল—আমাকে ছেড়ে দে সুধা। কাল থেকে আমি আবার ফ্লাইং-এ যাব ভাবছি—তুই বেড়িয়ে আয় ক'দিন। তাছাড়া আমি সবে তো বাইরে থেকে ঘুরে এলাম—

সুধা হতাশ চোখে তার দিকে তাকায়—চল না দাদা, চৈতীর মামাকেও একবার দেখিয়ে নিতে পারবি। যখন সুযোগ এসে গেছে—

একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে বলে—দূর, আমাকে আর দেখতে হবে না। আমি ঠিক আছি। বরং পারলে তোকে একবার দেখিয়ে নিস—

—কেন, আমার কী হয়েছে?

আড়চোখে একবার ওর মুখের দিকে দেখে নিয়ে হাসল সুনীথ—না, তেমন কিছু নয়। তবে তোর নাকের ডগাটা দেখিয়ে বলবি, সার, রাত্তির হলে এটা বড় বেশি ডাকাডাকি করে। যদি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন—

সুধা রেগে ওঠে—আমার নাক ডাকে, তাতে তোর কি?

—না, আমার কিছু নয়—তবে তোর জন্যে একটা কানে কালা ছেলের খোঁজ করে বেড়াতে হবে আমাকে, এই আর কি—

সুধা মুখে ভেংচি কাটল—আ-হা-হা, কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছে আমার জন্যে ছেলে খুঁজতে?

—কেন রে, তুই নিজেই সেটা ঠিক করে ফেলেছিস নাকি?

—ভাগ্। তার মাথায় চাঁটি মারে সুধা।

সুধাকে রাগতে দেখে সে বেশ মজা পায়। মিটিমিটি হাসে। কিন্তু সুধা খোঁচাটা যেন সহজেই হজম করে নিল। আবার তার কাঁধে হাত রাখে—চল না দাদা, প্লীজ—

আস্তে আস্তে তার মাথার চুলের মধ্যে আঙুল টানতে শুরু করে সুধা। এই পরিচর্যাটা সুনীথের খুব প্রিয়। কোন কারণে শরীর খারাপ হলে মা কিংবা সুধার হাতে এটা তার বাঁধা। ঘন চুলের গভীরে সুধার নরম আঙুল-গুলো এঁকেবেঁকে তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়। সুখের আবেশে সে চোখ বন্ধ করে। সুধা গুন গুন করে একটা গানের সুর ভাঁজে। গানটা ও প্রায়ই গায়ঃ যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু—দ্বার ভেঙে

তুমি এস মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেও না প্রভু—

মিষ্টি সুরেলা গলা সুধার। সকালের স্নিগ্ধ হাওয়ায় গানের কথাগুলো তার কানের মধ্যে যেন এক অপূর্ব পবিত্রতার সুরে বাজতে থাকে। বহু দিন শোনা গানটা যেন এই মুহূর্তে তাকে এক নতুন অনুভূতিতে ভরিয়ে তোলে।

তার হৃৎপিন্ডের কোথাও লুকিয়ে থাকা সেই গুনগুন শব্দটার কথা মনে হয়। কিন্তু কে তার বুকের দরজায় দাঁড়িয়ে এমন রহস্যময়ভাবে কড়া নেড়ে চলেছে! সমস্ত জীবনের স্বপ্নকে তছনছ করে কে তার বুকের মধ্যে সেই সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! তাকেও কি বলা যায়—তুমি দাঁড়াও, অপেক্ষা কর, 'ফিরিয়া যেও না'?

সিরসির করে সেই সুরটা কেমন করুণ হয়ে কাঁপতে থাকে তাকে ঘিরে।

দুপুরে খাবার টেবিলে কথাটা আর একবার উঠল। সুধার হয়ে মা আর একবার বললেন তাকে। সুনীথ মাথা নাড়ল—না মা—আমি এখন যেতে পারব না, সুধা ঘুরে আসুক। কাকা প্রথমটা চুপচাপ ছিলেন। পরে তিনিও বললেন। কয়েকদিন বাইরে কাটিয়ে এলেই নাকি সবচেয়ে ভাল। দিনরাত গুম হয়ে বসে বসে চিন্তা করলে শরীর মন দুটোই ভেঙে পড়ে। ভেবে দেখলে, হতাশ হবার মতো তো এমন কিছুই ঘটেনি। একটা অ্যাম্বিশান সার্থক হল না বলে কী এসে যায় এই বয়সে? উদ্যোগ থাকলে এখনো কত কী করা যায়। আর এয়ারফোর্সের লাইফ কি খুব একটা ভাল নাকি? অসামাজিক বাউন্ডুলে জীবন; সব সময় একটা টেনশানের মধ্যে থাকা, ফ্যামিলি, বন্ধুবান্ধব কারো সঙ্গে ঠিক মতো যোগাযোগ রাখা যায় না। এর জন্যে কেউ এতটা ভেঙে পড়ে নাকি? বাইরে-ফাইরে দু'-চার দিন বেড়িয়ে এসে ঠিক মতো আবার একটা কিছু নিয়ে লেগে পড়তে পারলে কোথায় চলে যাবে এইসব ভাবনা।

কথা বলতে বলতে কাকা খুব তৃপ্তির সঙ্গে একটা ঢেকুর তুললেন। তাঁর খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুনীথের মুখের দিকে তাকিয়ে আরও খানিকক্ষণ বসে রইলেন তিনি। সম্ভবত তার কাছ থেকে কোন একটা উত্তর আশা করছিলেন। সুনীথ মুখ বুজে কোনমতে খাওয়াটা শেষ করতে চায়।

আকাশে কোন ভারি এয়ারক্র্যাফ্‌টের শব্দ। প্রচন্ড আওয়াজে যেন থরথর করে কাঁপছিল বাড়িটা। সুনীথ চমকে ওঠে হঠাৎ। উন্মুখ হয়ে শব্দটার শেষ পর্যন্ত কান পেতে থাকে। শব্দটাকে এই মুহূর্তে তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ কোন

প্রিয়জনের আহ্বানের মতো মনে হয়। শরীরের মধ্যে লাফিয়ে বেড়ায় বহু-দিনের চেনা সেই উত্তেজনার স্রোত।

কাকা আবার তাকে বোঝাচ্ছিলেন। ব্যবসার কাজকর্ম এইবার একটু-আধটু দেখে নেবার কথা। এইটাই নাকি তার পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে। ঘরের ছেলে ঘরে থাকবে। অবসর মতো শখ করে দু'-একদিন ফ্লাইং ক্লাবেও যেতে পারবে।

কিন্তু কাকার সব কথাগুলো যেন পুরোপুরি তার কানে পৌঁছয় না। কেমন ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে যায়। তার কানের মধ্যে, মাথার ভিতর একটাই শব্দ বাজছিল তখন। অন্য আর কোন দিকে সে মনোযোগ দিতে পারে না।

এখনি একবার ফ্লাইং ক্লাবের দিকে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। কতদিন সে আকাশে ওঠেনি। ডিয়ারের কক্‌পিটের সেই পরিচিত গন্ধটার আকর্ষণ তাকে তীব্রভাবে টানছিল। চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ডেভিডের মুখটা। আনন্দে কৌতুকে যেটা সব সময় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

মনে মনে আজই একবার ফ্লাইং ক্লাবের দিকে যাবার কথা ভাবল। পরক্ষণেই মনে পড়ল স্কোয়ান লীডার ডেভিড তো আজ বাড়িতেই কাটান। তবে সে তাঁর বাড়িতেই যাবে। বাড়িতে গিয়েই আজ তাঁদের সঙ্গে দেখা করবে।

বাইরে দারুণ রোদ। প্রখর তেজে দুপুরটা ঝলসে উঠছে। প্যান্ট শার্ট পরতে পরতে সে জানলা দিয়ে রাস্তাটা দেখল। ছাত থেকে একটা গরম ভাপ উঠে আসছে ঘরের মধ্যে। জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করে একবার আয়নায় মুখটা দেখল। চুলের ওপর চিরুনি বুলিয়ে নিল আর একবার।

কিন্তু বেরোতে গিয়ে আবার বাধা। দরজার বাইরে পা দিতেই দেখল সুধা চৈতীকে নিয়ে উঠে আসছে তার ঘরে।

তাকে দেখেই চৈতী হাসল—কী ব্যাপার, তুমি নাকি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও না? প্রশ্নটা মুখে নিয়েই সে এগিয়ে আসে। তেমনি সহজভাবে ভুরু বাঁকিয়ে তার দিকে তাকায়। সেই ছেলেমানুষী ঘটনাটা যেন কবে ভুলে গেছে সে। তার চোখেমুখে আবার সেই সাংঘাতিক ধারালো খেলা—তোমার অসুবিধেটা কোথায় সুনীথ?

এই দারুণ গরমেও কোন অয়েলি মেক-আপ নিয়েছে চৈতী। লালচে মুখটা অসম্ভব তেলতেলে। মাথায় প্রকাণ্ড কোনারকী খোঁপা। ফিকে লাল ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম।

হাত দুটো কোমরে গেঁথে সোজা হয়ে দাঁড়াল সুনীথ—আমি গিয়ে কী

করবো তোমাদের সঙ্গে বলো? গান জানি না, নাচতে পারি না—ফাইফরমাশ খাটা ছাড়া, আর তো কোন কাজ হবে না আমার দ্বারা।

—তাই নাকি? শরীর নাচিয়ে ঝনঝন করে হেসে উঠল চৈতী। সুধাও হেসে ফেলে তার কথায়।

—ঠিক আছে। তোমায় একটা বড় দায়িত্ব দিচ্ছি, তুমি আমাদের ম্যানেজার হবে, রাজী?

—ম্যানেজার আমি? সুনীথ হাসল—তাহলেই হয়েছে, লাইফে যে কোন-কিছুই ঠিক মতো ম্যানেজ করতে পারল না, সে হবে ম্যানেজার!

ঠোঁট টিপে খোঁপা দোলায় চৈতী—সে ভাবনা তো আমার, তোমার নয়।

—তাই কি হয়? আমার একদম মুড নেই চৈতী, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, প্লীজ—

হঠাৎ কেমন দৃঢ় হয়ে যায় তার গলার স্বর। চৈতী তবুও বলে যেতে লাগল তাদের প্রোগ্রামের কথা। কোথায় কোথায় বেড়াবে। কে কে যাচ্ছে সঙ্গে। অমিত ফিরেছে পশ্চিম জার্মানী থেকে। সেও আসছে দিল্লীতে তখন। অমিত নাকি এখনো তেমনি ছেলেমানুষ আছে। শেষ চিঠিতে এক মজার প্রস্তাব করে বসেছে। বলতে বলতে চোখ দুটো পলকের জন্যে রহস্যময় হয়ে ওঠে চৈতীর।

তার ছোটমামার কথাও বলল। খুব নামকরা হার্ট স্পেশালিস্ট। তার ইচ্ছে ছিল, গিয়েই তাঁর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করবে সুনীথের জন্যে। তারপর হঠাৎ বলল—জানলে সুনীথ, আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডঃ নাগকে বলেছিলাম তোমার কেসটা। উনি বললেন—মার্মারটা তো এমন মারাত্মক কিছু নয়, অনেক কারণে এমন হতে পারে; কিন্তু কেন উঠছে শব্দটা সেটাই আসল।

চৈতীর গলার স্বর, মুখের ভঙ্গি পাল্টে যায়—তোমার কি মনে হয় সুনীথ, কেন হচ্ছে শব্দটা বলো তো?

মেঝেতে পা ঠুকে দাঁড়াবার ভঙ্গি বদল করে চৈতী। শুকনো পাতা উড়ে যাওয়ার মতো খসখস শব্দ ওঠে শাড়িতে। সুনীথ আবার বাইরের দিকে তাকাল। তামাটে পোড়া আকাশ থেকে আগুনের ঝলক নামছে। চৈতীর চোখেও যেন তার হলকা। কেন হচ্ছে? কেন হচ্ছে? কেন উঠছে সেই শব্দ? প্রশ্নটা তার সমস্ত শরীরের ভিতর যেন খামচে বেড়ায়।

অসহায়ভাবে সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল শুধু। মাথা নাড়ল নিঃশব্দে, আমি জানি না, জানি না—। খোঁচা লাগা পুরনো ক্ষতের মতো

অস্বস্তিটা আবার টন টন করে ওঠে। চৈতীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে সে এবার প্রায় ছুটে বেরিয়ে যায় সেখান থেকে। রাস্তায় এসে একটা খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে উঠে পড়ে।

থলথলে আগুনের গোলার মতো সূর্যটা ক্রমশ পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ছে। ফাঁকা রাস্তা জুড়ে এখন ঘন গাছগাছালির ছায়া। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় ধুলোর ঘূর্ণি। ট্যাক্সিটা একটু আগেই ছেড়ে দিল সুনীথ। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ডেভিডের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড বাগান ঘেরা কোয়ার্টার। বাংলো প্যাটার্নের সাদা একতলা বাড়ি। গেটে বাদামী রঙের নেমপ্লেটঃ স্কোয়াড্রন লীডার এঁ আর ডেভিড। আই এ এফ।

চারদিকে এক থমথমে নিস্তব্ধতা। বারান্দায় সাজানো এক সারি সবুজ বেতের চেয়ার। দরজায় সবুজ পর্দা। এক পাশে পা ছড়িয়ে একটা অ্যালসেশিয়ান গভীর ঘুমে মগ্ন।

বেল টিপতেই বেয়ারা দরজা খুলে দিল—সাব ঘরমে নেই হ্যায়, হুজুর—

—মেমসাব?

—মেমসাব গার্ডেনমে হ্যায়, বৈঠিয়ে।

বেয়ারা তাকে বসতে বলে মেমসাহেবকে খবর দিতে গেল। কিচেনের পিছন দিকে সবজি বাগান। রিখি সেই বাগানের পরিচর্যায় ব্যস্ত। বাড়ির সামনের দিকে প্রকাণ্ড লন, ফুলবাগান, গাছগাছালির সার। আর রান্নাঘরের লাগোয়া কিচেন গার্ডেন। সব মিলিয়ে যেন একটা নিরিবিলি বাগানবাড়ির পরিবেশ। জানলার বাইরে কয়েকটা পিরামিডের মতো ঝাউ, গোলাপ, পাতাবাহার, রজনী-গন্ধার ঝাড়। বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ উঠছে ঝাউপাতার।

ঘরের মধ্যে কালো রঙের সুন্দর একটা পিয়ানো। তার ওপর ফটো স্ট্যাণ্ডে রিখি আর ডেভিডের ছবি। কোন এক সী বীচে দাঁড়িয়ে তোলা। রিখির পরনে ব্রিচেস আর টিউনিক। দুজনেই হাসছেন। ডেভিডের তখন গোঁফ ছিল। অনেক পাতলা ছিল শরীরটা।

ছবির পাশে একটা সাদা কাঠের ঘোড়া, একখানা ক্যানবেরা এয়ারক্র্যাফ্‌টের মডেল। ঘোরানো স্ট্যাণ্ডের ওপর যেখানা শূন্যের দিকে ওড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। তলার দিকে খোদাই করে কী সব লেখা। হয়ত পুরনো কোন স্কোয়াড্রন ছেড়ে আসবার সময় ফেয়ারওয়েলে এগুলো গিফ্‌ট্‌ পেয়েছিলেন ডেভিড।

সুনীথ একটা সিগারেট ধরিয়ে ভেতরের দরজার দিকে তাকায়। রিখির গলা শোনা যাচ্ছে। পরমুহূর্তেই পর্দা সরিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন। সবজি বাগান থেকে সোজা চলে এসেছেন। হাতে এখনো ধুলোবালি, পরনে সাদা শর্টস, ছোট নাইলনের গেঞ্জী। অনাবৃত বাহুমূলে, গলায় চিকচিক করছে ঘাম। সমস্ত শরীরে একটা সতেজ বন্য ভঙ্গি।

সুনীথ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অ্যাটেনশান হয়ে তাঁকে উইশ করে—গুড ইভনিং ম্যাডাম।

—গুড ইভনিং সানিথ, তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, কিছু মনে করনি তো?

—একদম নয়—আমিই বোধ হয় একটু অসময়ে বিরক্ত করলাম।

—ও নো, য়ু আর অলওয়েজ ওয়েলকাম হিয়ার।

একটা টাওয়েলে হাত মুছতে মুছতে রিখি ডিভানের ওপর বসলেন। ফরসা শুকনো তোয়ালেটা দিয়ে মুখটাও ঘষে নিলেন। রক্তের আভার মতো একটা মসৃণ উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর দু' গালে।

বললেন—আমি কিন্তু খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম সানিথ, এতদিনের মধ্যে তুমি একবারও দেখা করলে না। অবশ্য তোমার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি; এটা কখনোই কল্পনা করতে পারিনি। ভীষণ শক্‌ড্‌ হয়েছি আমরা খবরটা পেয়ে—ইট ওয়াজ টেরিব্‌লি শকিং টু আস।

রিখির গলাটা ক্রমশ গভীর হয়ে ওঠে—ডেভিড তো খুব দুঃখ পেয়েছে সানিথ, স্পেশালি তোমার ওপরেই তো ওর একস্‌পেক্‌টেশান ছিল সবচেয়ে বেশি।

সুনীথ মাথা নিচু করে বসে থাকে। তার অকৃতকার্যতা যেন এই মুহূর্তে একটা অপরাধবোধের মতো তাকে চেপে ধরে। মাথার ওপর পুরনো সিলিং ফ্যান থেকে একটা কিরর্‌ কিরর্‌ শব্দ। শব্দটা কাঁটার মতো কোথাও বিঁধছিল।

রিখি তার সামনে বসে। সুন্দর সুগঠিত পা দুটো আড়াআড়িভাবে গাঁথা। সে চোখ তুলতে গিয়েও নামিয়ে নেয়। এত সংক্ষিপ্ত পোশাক পরা অবস্থায় রিখিকে এর আগে কখনো দেখেনি। তাকালে যেন চোখ ঝলসে আসে। একটা মিহি জ্বর-জ্বর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে শরীরের মধ্যে। কার্পেটের দিকেই তাকিয়ে থেকে সে ডেভিডের কথা জানতে চায়।

রিখি একটু নড়ে বসলেন। হাঁটুর খাঁজে নীল শিরার আঁকিবুকি।

—ডেভিড তো আজ স্টেশান কমানডারের ফেয়ারওয়েল পার্টির জন্যে সকাল থেকে মেতে আছে। বোসো একটু, এক্ষুনি এসে পড়বে মনে হয়।

—স্টেশান কমানডার কি চলে যাচ্ছেন?

—তুমি জান না? গ্রুপ ক্যাপটেন জেকব তো এয়ার কমোডোর হয়ে যাচ্ছেন।

সুনীথ মাথা নাড়ে। সে এখন এসব কোন খবরই আর রাখে না।

রিখি উঠে দাঁড়ালেন—তুমি কী খাবে বলো, কোল্ড ড্রিংকস্, না গরম কিছু?

—যেটা আপনার খুশি।

সুনীথ তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে, তারপর হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। রিখির প্রায় উন্মুক্ত দেহ যেন এক নিষিদ্ধ দৃশ্যের মতো তার সামনে দাঁড়িয়ে! তার আড়ষ্ট ভাবটা নজরে আসে রিখির। মৃদু স্বরে বলেন—একটু বোসো সানিথ, আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।

একটু পরেই আবার ফিরে এলেন তিনি। হালকা প্রসাধনের ছোপ চোখে-মুখে। একটা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে এসেছেন এবার। সঙ্গে বেয়ারার হাতে চায়ের সরঞ্জাম। কাজু বাদাম ভর্তি একটা প্লেট। মুখোমুখি বসে দু' কাপ চা ঢেলে দুধ চিনি মেশালেন। তারপর একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন—নাও সানিথ।

চা খেতে খেতে আবার দুঃখ করতে লাগলেন রিখি। বললেন—তুমি কি এবার কমারশিয়াল লাইনের জন্যে চেষ্টা করবে?

সুনীথ ঘাড় নাড়ল—এখনো কিছুই ঠিক করিনি, আসলে এর বিকল্প হিসেবে আমি কিছুই ভাবতে পারছি না।

—আমি জানতাম, তুমি এই রকম একটা কিছু বলবে—য়ু আর টিপিক্যালি এয়ারফোর্স মাইনডেড্। সব সময় কেবল এই একটা কথাই ভাবতে তুমি, আর ডেভিড তোমার সেই অ্যাম্বিশানটাকে দিনে দিনে বাড়িয়ে আরও তীব্র করে দিয়েছে। এটা ভেঙে যাওয়া যে কী মর্মান্তিক সেটা আমি বুঝি, সানিথ। কিন্তু কী করবে বলো? যেটা ঘটে গেছে সেটাকে তো মেনে নিতেই হবে। পাইলটদের জীবনে তো সব সময় অ্যাকসিডেন্টের ঝুঁকি, মনে কর না কেন, এটাও জাস্ট একটা অ্যাকসিডেন্ট। ভীষণ একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলে তুমি। হয়ত আরও ব্রিলিয়াণ্ট, আরও সুন্দর কোন কেরিয়ার তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কথা বলতে বলতে রিখি মৃদু হাসলেন। তাঁর চোখে এক গভীর দৃষ্টি। দু'কানে দুটো বেদানা রঙের পাথর ঝিকমিক করছে। পায়ের নিচে হলুদ হরিণের ঝাঁক। ঘরজোড়া প্রকাণ্ড কার্পেটের চারদিকে রাশি রাশি ছুটন্ত হরিণের ছবি। মাথার ওপর সমানে সেই কিরর্ কিরর্ শব্দ। সুনীথ নির্বাক হয়ে বসে থাকে।

রিখি আবার বলছিলেন—দেখ সানিথ, একদিক থেকে ভেবে দেখতে গেলে সবার জীবনেই কিছু না কিছু ব্যর্থতার ঘটনা আছে। কারও কম, কারও বেশি। সব আশা পূর্ণ হয়েছে এমন একটা মানুষও তুমি পাবে না। আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন আমার অ্যাম্বিশান কী ছিল জানো? ইট ওয়াজ মিউজিক—খুব বড় একজন গাইয়ে হবার স্বপ্ন ছিল আমার। সারা জীবন গান-বাজনা নিয়ে কাটিয়ে দেবার কত অদ্ভুত কল্পনা করেছি তখন। বাট লুক অ্যাট মী নাউ—কোথায় ভেসে গেছে সে-সব কল্পনা! এয়ারফোর্স লাইফের এই হল্লাগুল্লোয় কেমন অনায়াসে মিশে গেছি। অবশ্য তাই বলে, সে-সব যে কখনো ভাবি না তা নয়—মাঝে মাঝেই হন্ট করে। জাস্ট লাইক এ রিদম্, আমার ভেতরে কোথাও টনটন করে ওঠে সেটা।

হঠাৎ সুর পাল্টে তিনি যেন ঠাট্টা করতে চাইলেন একটু—এটাও হয়ত একটা মার্মার সানিথ, আগে ধরা পড়লে আমাকেও বিদায় দিত এয়ারফোর্স।

একটা বিষণ্ণ হাসিতে ভরে উঠল তাঁর মুখটা। বাইরে বেলা শেষ হয়ে আসছে। বাতাসে ঝাউপাতার সাঁই সাঁই শব্দ। রিখি উঠে আলোটা জ্বাললেন। নিঃশব্দ এক উজ্জ্বলতার বিস্ফোরণে যেন হঠাৎ চমকে উঠল ঘরটা।

সুনীথ বলে ওঠে—বাট দিস ইজ অ্যাবসার্ড, পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে এখনো অবিশ্বাস্য লাগছে। জানি কোন লাভ নেই, তবু এখনো আমার একবার চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছে করছে মেডিক্যাল বোর্ডকে।

—বাট য়ু ক্যান নট চ্যালেঞ্জ দেম—সেইটেই তো মজা। আমি বিশ্বাস করি সানিথ, তুমি এয়ারফোর্সে গেলে নিশ্চয়ই শাইন করতে—খুব উঁচুতে পেঁাছে যেতে তুমি। কিন্তু সে-সব কথা ভেবে এখন আর কী লাভ বলো? আই ফিল ফর য়ু রিয়েলি।

মাথা নেড়ে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেললেন তিনি। টলটলে চোখ দুটো যেন সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। শান্ত অপলক দৃষ্টি। তন্ময় হয়ে ভাবছেন কিছু। তাঁর পায়ের নিচেয় এখনো সেই ছুটন্ত হরিণের পাল।

রাস্তার দিক থেকে ডেভিডের গাড়ির হর্ন শোনা গেল। রিখি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন—এইবার আসছে ডেভিড—

বলেই বারান্দার দিকে বেরিয়ে গেলেন। ডেভিডের কুকুরটা ডাকছে। কুকুরটাকে আদরের সুরে ধমকাতে লাগলেন রিখি—জিমি, জিমি—। গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে কী যেন বলতে বলতে এগিয়ে আসছেন ডেভিড।

তার উপস্থিতির খবর পেয়ে দরজার বাইরে থেকেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—হাল্লো সানিথ, হয়ার হ্যাভ য়ু বীন সো লঙ—এঃ—কোথায় অদৃশ্য

হয়েছিলে এতদিন? আমার সঙ্গে একবারও দেখা করনি কেন—হোয়াই ফিলিং শাই অর অ্যাংগ্রি?

ডেভিডের মুখে সেই সরল হাসি। খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। কথা বলতে বলতে য়ুনিফর্মের বোতামগুলো খুলে নিয়েছেন। উল্কি আঁকা তামাটে বুক ঘামে ভিজে সপসপে।

সুনীথ উঠে দাঁড়াতেই তাকে হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন তিনি। গভীর আবেগে শক্ত করে চেপে ধরলেন শরীরটা। তারপর পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বললেন—আমি সব খবর পেয়েছি সানিথ, অল ইন ডিটেল্স্। বুঝতেই পারছ, এটা আমার কাছে কী শকিং নিউজ! কিন্তু এতে দমে গেলে চলবে কেন? জীবনে এমন অনেক কিছুই ঘটে যায় যা আমরা কখনো ভাবিনি। বরং এর চেয়েও অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হয়—দিস ইজ লাইফ, মাই ফ্রেন্ড।

ডেভিডের ঘর্মাক্ত দেহটা যেন তাকেও ভিজিয়ে দিল। মেস থেকে হয়ত বীয়ার খেয়ে এসেছেন। ঘাম আর বীয়ারের গন্ধে টইটম্বুর শরীরটা তাকে কেমন আচ্ছন্ন করে আনছিল।

এবার তাকে ছেড়ে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। সোনালী টিপ লাগানো লম্বা বিদেশী সিগারেট। তার হাতেও একটা বাড়িয়ে দিলেন। রিখি এক রাউন্ড চায়ের প্রস্তাব করতেই বললেন—নো, ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব আমরা, তুমি জলদি রেডি হয়ে নাও।

তারপর সুনীথের দিকে তাকিয়ে বললেন—সানিথ, তুমিও চল আমাদের সঙ্গে, আজ আমাদের গেস্ট তুমি। গ্রুপ ক্যাপটেন জেকবের ফেয়ারওয়েল পার্টি—হোল নাইট প্রোগ্রাম। য়ু উইল এনজয় ইট।

সুনীথ ইতস্তত করে একটু। মৃদু আপত্তি জানাতে চায়। সে ঠিক প্রস্তুত হয়ে আসেনি এর জন্যে। বাড়িতেও কিছু বলা নেই।

রিখি হাসলেন তার বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে—চল সানিথ, খুব খারাপ লাগবে না অনুষ্ঠানটা। আর বাড়ির জন্যে ভাববার কী আছে? ফোন করে দাও একটা এখান থেকে, তাহলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

ডেভিড কথাটা লুফে নিলেন—ভেরি গুড আইডিয়া। তাছাড়া তুমি কি একেবারে বাচ্চা? তোমার মতো ইয়াং ছেলেরা যদি দু'-একটা রাত বাইরে না কাটায় তো কারা কাটাবে? আর কোন কথা নয়, তুমি যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে।

একবার একটা খেয়াল চেপে গেলে ডেভিডকে তা থেকে নিরস্ত করা শক্ত। সরাসরি না-ও বলা যায় না তাঁকে। অগত্যা রাজী হতে হয় সুনীথকে।

তার মানসিক অবস্থাটা আন্দাজ করেই হয়ত ডেভিড জোর করে এইরকম একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চান তাকে।

বেয়ারাকে কোল্ড ড্রিংকস্ আনতে বললেন ডেভিড। ঠাণ্ডা কোকাকোলা এল তিন বোতল। একটা বোতল ফিরিয়ে দিয়ে রিখি বললেন—এক্স্কিউজ মী ফর এ ফিউ মোমেণ্টস্—আমি ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিই।

—ও কে, য়ু আর এক্স্কিউজড্—বলে ঢক ঢক করে বোতল উপুড় করে ঠাণ্ডা পানীয় গলায় ঢালতে শুরু করলেন ডেভিড। খানিকটা ছিটকে তাঁর বুকেও পড়ল। নিজেই হাসলেন সেদিকে তাকিয়ে।

বোতলটা শেষ করে এবার হঠাৎ বললেন—কিন্তু তুমি ফ্লাইং-এ আসছ না কেন সানিথ? অ্যাকাডেমিতে না যেতে পারলেও, তোমার ফ্লাইং-এ তো বাধা নেই। কোর্সটা শেষ করে রাখ, তারপর যখন ইচ্ছে হবে ক্লাবে এসে দু'-একটা সর্টি করে যাবে। হবি হিসেবেও এর চেয়ে থ্রিলিং আর কিছু নেই। সামনের সপ্তাহ থেকেই তুমি আবার আসবে—রাইট?

সুনীথ মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায়—রাইট সার, আমি আসব। আমারও খুব ভাল লাগছে না এইভাবে দিন কাটাতে, মনে হচ্ছে আমি যেন সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়ছি!

—নো; দ্যাট ইজ ভেরি ব্যাড—এইসব চিন্তা একেবারেই আমল দেবে না। য়ু আর পারফেক্টলি অল রাইট। এই হার্ট মার্মারটা এমন একটা কিছু ব্যাপার নয়; আর তোমার ক্ষেত্রে তো এটা একটা সন্দেহ মাত্র—হয়ত এটা কিছুই নয়। যে কোন কাজের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত তুমি। ইচ্ছে করলে, যে কোন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেও তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার।

—কিন্তু এয়ারফোর্সে কেন নয়, সার?

—ওয়েল, এয়ারফোর্সের জি ডি ব্রাঞ্চে কাজটা একটু আলাদা ধরনের, তুমিও সেটা বোঝ। শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে সব সময় এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হয় তোমাকে যে, সেখানে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ রাখা চলে না। কক্পিটে বসলে তুমি সম্পূর্ণ একজন ভিন্ন মানুষ, তখন তোমার সামনে কেবল একটাই লক্ষ্য—অ্যাণ্ড দ্যাট ইজ ইয়োর মিশান অ্যাণ্ড অপারেশান।

সুনীথ জানতে চায়, কিন্তু সিলেকশান বোর্ড যাদের ফিরিয়ে দেয় তারা সবাই কি সত্যিই এই কাজের অনুপযুক্ত? অনেকে তো এই ঘটনার পরও কমারশিয়াল পাইলট হিসেবে বেশ সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। দ্বিতীয়বার মেডিক্যাল পরীক্ষায়ও তাদের কোন খুঁত ধরা পড়েনি। এ রকম অনেক

ঘটনার কথাই তো সে শুনেছে।

ডেভিড বললেন—ট্রু, আমিও জানি সে কথা। তবে কি জানো, কমার্শিয়াল পাইলটদের কাজটা অনেকটা রুটিন বাঁধা। বিপদের সম্ভাবনাগুলো এড়িয়েই তারা ফ্লাই করতে পারে। কিন্তু তবুও আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা ঠিক পছন্দ করতে পারি না। সামান্য সন্দেহ থাকলেই প্রফেশান হিসেবে এটা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। আমারও ইচ্ছে সানিথ, তুমি এটাকে একটা হবি হিসেবে নাও —ডোন্ট টেক ইট অ্যাজ ইয়োর ব্রেড অ্যান্ড বাটার।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার নিজেই বলতে শুরু করেন তিনি— আকাশ একটা দারুণ নেশা, মাই বয়! একবার এর স্বাদ পেয়ে গেলে সে আকর্ষণ কাটানো বড় শক্ত। বিশেষ করে তোমার মতো একজন সম্ভাবনাপূর্ণ পাইলটের পক্ষে। তাই বলছিলাম, একটা শখ হিসেবে তুমি এটাকে বেছে নাও। স্বাধীনভাবে যখন খুশি এয়ারক্র্যাফ্‌ট নিয়ে উড়ে বেড়াবে আকাশে। যাই হোক, নেকস্‌ট্‌ উইক থেকে তুমি চলে এস ক্লাবে। আর মন থেকে সব আজে-বাজে চিন্তা একদম ঝেড়ে ফেল। এনজয় লাইফ, খাও পিও মৌজ করো অ্যান্ড বী চিয়ারফুল অল দ্য টাইম। বলতে বলতে ডেভিড হাসলেন হা হা করে। সেই পরিচিত হাসি।

বাইরে এলোমেলো হাওয়ার শব্দ। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার পক্ষে সন্ধ্যেটা বড়ো মনোরম। বাগানের অন্ধকারে জোনাকি জ্বলছে মিট মিট করে। হাওয়ায় ঝুপসি গাছগুলো দুলছে। ঝিঁঝি ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে। তার মধ্যে দিয়ে ওরা তিনজন এক সময় বেরিয়ে পড়ল। বাগান পেরিয়ে রাস্তায় পেঁছোতেই ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এল।

ড্রাইভারকে পাশে সরিয়ে ডেভিড নিজেই স্টিয়ারিং ধরলেন। বাঁদিকে প্রকান্ড মাঠ। রিখির পাশে বসে সুনীথ চুপচাপ মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঝাপসা অন্ধকারে কারা যেন পায়চারি করছে ওখানে। ফাঁকা রাস্তায় তীব্র বেগে ছুটছে গাড়িটা। শরীর জুড়নো ঠান্ডা হাওয়া। রিখির শরীর থেকে কোন মূল্যবান প্রসাধনের গন্ধ। খানিকক্ষণ চোখ বুজে কেমন নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো বসে রইল সুনীথ।

নয়

গাড়ি থেকে নামতেই চোখে পড়ে এয়ারফোর্স ক্লাব আজ বিশেষভাবে সাজানো। জাঁকজমক আর আনন্দে গমগম করছে পরিবেশটা। ফেয়ারওয়েল পার্টি, কিন্তু কোথাও কোন বিষণ্ণতার ছায়ামাত্র নেই। খুব বড় রকমের একটা আনন্দ উৎসব যেন।

চারদিকে নানা রঙের আলো, ফুল। থোকা থোকা রঙিন বেলুন। ব্যাণ্ডে নাচের বাজনা—চা-চা-চা। দ্রুত তালের বলরুম নাচ। হাসিমুখে কয়েকজন নারী ও পুরুষ একবার এগিয়ে একবার পেছিয়ে তালে তালে পা ফেলছে। গ্রুপ ক্যাপটেন জেকবকে দেখা গেল ব্যাঙ্কোয়েট হলের দরজায় উইং কমানডার চক্রবর্তীর সঙ্গে। তাঁদের সামনে স্কোয়ান লীডার দাশ, ফ্লাইং অফিসার বাজোয়া। খুব ফুর্তির মেজাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন জেকব। সবার হাতে রঙিন পানীয়।

মিসেস জেকব বসে আছেন নাচের আসরের সামনে। তাঁর পাশে স্কোয়ান লীডার মূর্তি। একটু আগেই হয়ত ও'রা নাচছিলেন। স্থূলকায়া মিসেস জেকব ক্লান্ত ভঙ্গিতে সোফায় এলিয়ে। মূর্তি কী একটা বলে তাঁকে হাসাবার চেষ্টা করছেন। তিনি হাসছেন মৃদু মৃদু।

জয়দীপ গল্প করছিল পাইলট অফিসার পুরুষোত্তমের সঙ্গে। পুরুষোত্তমের ডাকনাম পুষি। এখানকার সবচেয়ে জুনিয়ার অফিসার। মাত্র কয়েক মাস হল সে এই স্টেশানে এসেছে। নাচ-গান আর মজার মজার গল্প বলতে ওস্তাদ। জয়দীপের হাতে ড্রিংকস্, পা দুটো বাজনার তালে তালে দুলছে। সুনীথকে দেখে সে খুব দূর থেকেই চোখ টিপল। সুনীথ এগিয়ে গেল তার দিকে।

—আমি শীগগির আগ্রা চলে যাচ্ছি সুনীথ; ট্রানস্ফার অর্ডার এসে গেছে, সো গুড বাই মাই ফ্রেণ্ড। জয়দীপ তার হাত ধরে ঝাঁকাল।

কেমন দুঃসংবাদের মতো লাগে খবরটা। অথচ জয়দীপের চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বেশ কয়েক বছর হল সে এই স্টেশানে আছে। তবু কেমন মন খারাপ হয়ে গেল। অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হলেও, সে ঠিক কিছুই বলতে

পারে না এই পরিবেশে। জয়দীপের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে শুধু জানতে চায়—তোমার এনকোয়ারির কী হল জয়?

—এনকোয়ারি বোর্ডের কাজ শেষ; আমাদের দু'জনেরই নাকি ফিফটি ফিফটি দায়িত্ব ছিল, সেই অ্যাকসিডেন্টে। অর্ধেক আমার, অর্ধেক মেশিনের —অবশ্য বোর্ডের শেষ রায় এখনো জানা যায়নি। রেহাই দেবে না আমায়, তা যেখানেই পালাই না কেন। তবে এখন আশা করছি শাস্তিটা হয়ত খুব কড়া হবে না। আর হলেই বা কি, আমি এখন আর কিছুই কেয়ার করি না—অ্যান্ড য়ু নো দ্যাট। বলতে বলতে জয়দীপের চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে কঠিন হয়ে ওঠে। তারপরই আবার হাসিতে ভরে যায়।

পুষির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সে. পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, সুনীথ এখনো একজন ক্যাডেট পাইলট। টেরিবলি ইন লাভ উইথ ফ্লাইং—ভবিষ্যৎ দারুণ সম্ভাবনাপূর্ণ।

সুনীথ প্রতিবাদ করতে গেল। এই পরিচয়ে সে ভীষণ বিব্রত বোধ করে এখন। কিন্তু জয়দীপ তাকে কোন সুযোগই দিল্ না। পুষির পরিচয় দিয়ে ততক্ষণে বলতে আরম্ভ করেছে—অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার ফ্রেন্ড পাইলট অফিসার পুরুষোত্তম—।

পুষি হাত বাড়িয়ে দেয় তার দিকে। ড্রিংকস্ অফার করে। সুনীথ ধন্যবাদ দিয়ে ডেভিডের দিকে দেখাল—ও'রা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

জয়দীপ বলল—তুমি ওখানে বোসো সুনীথ, আমি আসছি।

সুনীথ ফিরে আসতেই ডেভিড চোখের ইঙ্গিতে নাচের আসরটা দেখালেন। গোয়েল সাহেব আর জেফ্রিকে দেখা গেল সামনে। টগবগ করে দুলছে জেফ্রির সারা দেহ। পরনে ব্রোকেডের মিনি স্কার্ট। সাপের খোলসের মতো নকশা-কাটা চারদিকে। টকটকে লাল ঠোঁট। মৃদু গোলাপী আলো পিছলে পড়ছে শরীর বেয়ে। ডেভিড সেদিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করেন একটু—সানিথ, নাচবে নাকি একবার জেফ্রির সঙ্গে? বেশ ভাল নাচে কিন্তু ও।

কৌতুকের সুরেই সে জবাব দেয়—সরি সার, আমি বোধ হয় পার্টনার হিসেবে ঠিক ম্যাচ করতে পারব না।

—কে বলেছে পারবে না? তোমার এখন এই রকম একজন পার্টনারই দরকার। রিখি হেসে উঠলেন শব্দ করে।

উর্দিপরা বেয়ারা এসে সামনে দাঁড়াল। হাতে ড্রিংকস্ ভর্তি ট্রে। ডেভিডই বেছে বেছে গ্লাস ধরিয়ে দিলেন সবার হাতে। চিমটে করে বড় বড় বরফের টুকরো মিশিয়ে দিলেন গ্লাসে। বললেন—এস সানিথ, আজ হোল নাইট ড্রিংক

করব আমরা।

রিখি চোখ পাকালেন—ডেভ, বাড়াবাড়ি করো না, প্লীজ।

ডেভিড হাসলেন—ও, নো—।

জয়দীপ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে তাদের টেবিলের দিকে। মাথা নিচু করে ডেভিড ও রিখিকে সুন্দর ভঙ্গিতে নড করল সে। ডেভিডকে বলল—সার, আমাদের গ্রুপ ক্যাপটেন আপনার ইনস্‌ট্রাকটার ছিলেন অ্যাকাডেমিতে?

—ইয়েস, তুমি জানলে কী করে সে কথা?

স্কোয়াড্রন লীডার মূর্তি গল্প করছিলেন; বলছিলেন ইনস্‌ট্রাকটার হিসেবে নাকি ভীষণ বদরাগী ছিলেন জেকব। এখন কিন্তু সার, মোটেই বোঝা যায় না সেটা।

—ইয়েস, ভেরি কারেক্ট, আমাদের ওল্ড জ্যাক খুব অল্পতেই রেগে উঠতেন, সেটা ঠিক। কিন্তু মাটিতে নামলেই আবার বন্ধু হয়ে যেতেন। একেবারে অন্য মানুষ তখন। আমাদের ভালও বাসতেন খুব।

ডেভিড তাঁর গ্লাস খালি করে ফেললেন। রিখি গ্লাস হাতে এক দৃষ্টিতে নাচের আসরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জয়দীপ হাত বাড়িয়ে তাঁকে নাচবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল—ম্যাডাম, মে আই—

রিখি হাসি মুখে জয়দীপের হাত ধরলেন—ও, শিয়োর—।

ইতিমধ্যে নাচের বাজনাটা বদল হয়ে গেছে। ট্যাংগো নাচের সুর বাজছে এবার। ঢিমে আর দ্রুত তালের মেশানো নাচ। শরীরটা সামান্য ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে পা ফেলছে সবাই। নতুন নাচের সঙ্গে সঙ্গে আলোর রঙও পাল্টে গেল। কয়েকজন বেরিয়ে এল ফ্লোর থেকে। নতুন করে যোগ দিল কয়েকজন। পুষির সঙ্গে গেলেন মিসেস মূর্তি। চোপরা ঢুকল মিসেস চক্রবর্তীর হাত ধরে।

ছেলেদের মধ্যে জয়দীপই দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল সবচেয়ে বেশি। বাজনার তালে তালে তার ছিপছিপে দীর্ঘ দেহটা অপূর্ব ভঙ্গিতে দুলে উঠছিল। অত্যন্ত ক্ষিপ্রপদে সে ফ্লোরের এদিক থেকে ওদিক জায়গা বদল করে ঘুরছিল। রিখিও সমানে পাল্লা দিচ্ছেন জয়দীপের সঙ্গে।

দেখতে দেখতে রীতিমত জমে উঠল নাচের আসরটা। ফ্লাইং অফিসার বাজোয়া, স্কোয়াড্রন লীডার দাশ, মিসেস দাশ একে একে সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন এদিকে। বাজোয়া দু'বার মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বার করে ওদের উৎসাহিত করল।

ডেভিডও বাজনার তালে তালে মাথা নাড়ছিলেন দু'-একবার। পর পর

দুটো পেগ শেষ করে সুনীথের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন—ম্যাডাম এখন ভীষণ ব্যস্ত; এস সানিথ, মীন হোয়াইল লেট আস ফিনিস এ কাপল্ অফ ড্রিংকস্—তাড়াতাড়ি কয়েকটা পেগ শেষ করে নিই এই ফাঁকে।

তাঁর ছেলেমানুষী ভঙ্গি দেখে হাসি পায় সুনীথের। একটা গ্লাস নিয়ে সোজা একঢোকে গিললেন সবটুকু। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে অনেকটা দার্শনিক ভঙ্গিতে বলে চললেন—দেখ সানিথ, লাইফে সব কিছু সহজভাবে মেনে নিতে চেষ্টা করা উচিত। এই যে অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক বলে যে ঘটনাগুলো নিয়ে আমরা উত্তেজিত হই, মুষড়ে পড়ি, সেগুলো অযথা মনের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করে। এটাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা অসুখে দাঁড়ায়—এ ভেরি ডেলিকেট অ্যান্ড মডার্ন ডিজিজ। তাই বলছিলাম, যা ঘটে গেছে তাকে তুমি স্বাভাবিকভাবে মেনে নাও—দ্যাট ড্যাম মার্মার বিজনেস! যে অবস্থাই আসুক না কেন, জীবনে তার মধ্যেই তোমাকে চীয়ারফুল থাকতে হবে—এনজয় লাইফ অ্যান্ড এনজয় এভরি পার্ট অফ ইট।

অর্কেস্ট্রার একটানা তীব্র সুর, চারদিকে টুকরো টুকরো হাসিঠাট্টা। গল্পগুজবের গুঞ্জন, নানা আকারের কাচের পাত্রের টুং টাং, তার মধ্যে ডেভিডের কথাগুলোও যেন একই সুরে মিশে যাচ্ছিল।

নাচের আসরে দারুণ উত্তেজনার মুহূর্ত তখন। নাচতে নাচতে পার্টনার বদল করে নিয়েছে জয়দীপ। এখন জেফ্রির মুখোমুখি সে। জেফ্রির উগ্র দেহটা যেন ফণা তুলে এগিয়ে পেঁছিয়ে তাকে নাচাচ্ছিল। বাজোয়া আবার মুখ দিয়ে সেই তীব্র শব্দটা বার করল। জয়দীপের মুখে একটা মৃদু হাসি টোল খেয়ে যায়। তার সমস্ত অংগপ্রত্যংগ জুড়ে এখনো সেই অপূর্ব অনায়াস ভঙ্গি।

রিখির সঙ্গে নাচছেন গোয়েল। তাঁরা দুজনে এক পাশে ছিটকে সরে এসেছেন। পরিশ্রান্ত গোয়েল পাগলের মতো দেহটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রিখিকে নিয়ে ঘুরছেন। রিখির শরীরে এখনো এক সতেজ ভঙ্গি। হাসতে হাসতে এক একবার তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছেন। সুনীথ হাত নেড়ে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। ভ্রূ তুলে মৃদু হাসলেন তিনি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার বলে উঠলেন ডেভিড—হ্যাপি হবার সবচেয়ে সোজা রাস্তাটা কি জানো সানিথ? যখন দেখছ ঘটনাগুলো তোমার পছন্দ অনুযায়ী ঘটছে না, তখন যা ঘটছে, সেগুলোকেই পছন্দ করতে শেখা। তাহলেই তো সব সমস্যা মিটে গেল। বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন।

তাঁর চোখে এবার নেশার ঘোর দেখতে পাওয়া যায়। কথা বলতে বলতে

বেশ তৃপ্তির সঙ্গে পান করছেন।

একটু পরেই নাচের বাজনাটা থেমে গেল। আস্তে আস্তে উজ্জ্বল আলোয় ভারে উঠল ঘরটা। ফ্লোর থেকে বেরিয়ে যে যার বসে পড়ছে চারদিকে। রিখি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ধপ করে বসে পড়লেন।

ডেভিড বললেন—কি, খুব টায়ার্ড? তোমায় দেখতে কিন্তু ওয়াণ্ডারফুল লাগছে এখন।

রিখির সমস্ত মুখটা ঘেমে লাল। নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। সোফায় হেলান দিয়ে মৃদু হেসে বললেন—থ্যাঙ্ক য়ু ডেভ, গিভ মী এ ড্রিংক, প্লীজ।

স্কোয়ান লীডার মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছেন মাইকের সামনে—লেডিস অ্যাণ্ড মাই ফ্রেণ্ডস, আমাদের প্রীতি এবং ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে স্টেশান কমানডারকে সামান্য কিছু উপহার দেওয়া হচ্ছে এবার। গ্রুপ ক্যাপটেন জেকব সার, আপনি অনুগ্রহ করে এগুলো গ্রহণ করুন।

মোড়ক খুলে একে একে তাঁর হাতে উপহারগুলো তুলে দিতে লাগলেন মূর্তি। কাঠের ফ্রেমে বসানো সোনালী ঈগল, রুপোর পানপাত্র, নতুন কমব্যাট প্লেনের মডেল......

ঘন ঘন হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল ঘরটা। মাথা নিচু করে হাসিমুখে সবার অভিনন্দন গ্রহণ করলেন জেকব। তারপর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ধন্যবাদ জানালেন সবাইকে।

বললেন—আমি খুব খুশি; বন্ধুগণ, আকাশে বা মাটিতে বা যে কোন ব্যাপারে আপনাদের সবার কাছ থেকে বরাবর আমি যে সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্যে আমি আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ......

প্রবল করতালির মধ্যে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন জেকব। এবার উঠলেন উইং কমানডার চক্রবর্তী। স্থানীয় অফিসারদের পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করা হল। খুব সুন্দর বক্তৃতা করেন চক্রবর্তী। জেকবের জীবনের নানা কৃতিত্ব ও ভয়ংকর সব অভিজ্ঞতার কথা গল্পের মতো করে বললেন তিনি। আগুন ধরে যাওয়া ফাইটারের কক্‌পিট থেকে প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়ার মতো রোমাঞ্চকর ঘটনা জেকবের জীবনে নাকি দু'-দু'বার ঘটেছে। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী তিনি। তাঁর মতো অভিজ্ঞ বৈমানিকের নেতৃত্বে কাজ করতে পাওয়াও একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

একবার থেমে, চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন চক্রবর্তী—বন্ধুগণ, বিদায় অনুষ্ঠান কথাটার মধ্যে কেমন একটা দুঃখের ভাব আছে, আমি কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠানটাকে বিশেষ করে একটা আনন্দের

অনুষ্ঠান বলতে চাই। কারণ আমাদের প্রিয় জ্যাক এবার এয়ার কমডোর হতে চলেছেন। তাঁর এই উচ্চতর পদমর্যাদা লাভের জন্য আমরা সবাই দারুণ উল্লসিত। গ্রুপ ক্যাপটেন সার, আমাদের সবার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এবং আসুন আমরা সবাই মিলে এই রাতটাকে সুন্দরভাবে উপভোগ করি......

চক্রবর্তীর বক্তৃতার পর আবার মূর্তি এসে দাঁড়ালেন মাইকের সামনে—বন্ধুগণ, এবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছেন আমাদের কয়েকজন বিশেষ অতিথি। যদি আপনারা তাঁদের চিনতে পারেন তবে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করুন সকলকে, আর যদি চিনতে না পারেন তাহ'লে অভিনন্দন জানান তাঁদের।

দেখতে দেখতে বড় আলোগুলো নিভে গেল। একটা রঙিন ফোকসের মধ্যে দেখা গেল, হেলে দুলে হেঁটে আসছে একটি পাঞ্জাবী তরুণী। দেহাতী সাজসজ্জা, দু'হাত ভর্তি সবুজ কাচের চুড়ি, মাথায় প্রকান্ড একটা সবজির ডালা। কোমর দুলিয়ে এঁকেবেঁকে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে আপন মনে পথ চলেছে সে।

সুন্দর মেক আপ। রিখি কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন—কে এটা?

ডেভিড মাথা নাড়লেন, চিনতে পারছেন না ঠিক। জয়দীপকে বললেন—তুমি বুঝতে পারছ জয়, কে এই মহিলা?

জয়দীপ ফিস ফিস করে বলে—আমার মনে হচ্ছে, এটা মিসেস সহায়, সার।

জয়দীপের অনুমান সম্পূর্ণ ঠিক। কারণ তাঁর পিছনেই দেখা গেল ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সহায়কে। শিখ যুবকের বেশ। মাথায় পাগড়ি, মুখে নকল দাড়ি, পরনে লুঙ্গি আর কুর্তা। সর্দারজী সাজলেও তাঁকে বেশ চেনা যাচ্ছে। ভাঙরা নাচের পোজে এগিয়ে আসছেন সহায়। পা ফেলার তালে তালে কাঁধ দুটো নাচছে।

ঘরের মাঝামাঝি এসে মিসেসকে লক্ষ করে অদ্ভুত সুরে হাঁক পাড়লেন—ও পাঞ্জাবদি কুঁড়িয়ে, তুসি কিথে যান্দিও? বাজখাঁই গুরুমুখী টানে সেই লাস্যময়ী তরুণীকে একবার থামতে বললেন তিনি। কিন্তু পাঞ্জাবদি তরুণীটি সহজে বশ মানতে চায় না। দেহাতী সুরে সঙ্গে সঙ্গে সে-ও মুখিয়ে ওঠে—কেন, কী দরকার তোমার? দেখেও বুঝতে পার না, আসি বাজার যান্দি। চটুল ভঙ্গিতে শরীর মুচড়ে ওঠে মিসেস সহায়ের।

ফ্লাইট লুট সহায় ভাঙরা নাচের সঙ্গে গান জুড়লেন এবার—

ও কুঁড়িয়ে হাম তো লেট গ্যয়ে,

তেরি প্যার মে

ও বোলে—বোলে—বোলে—
উ আহ্‌ আহ্‌, উ আহ্‌ আহ্‌—
উ আহ্‌ আহ্‌—

চারদিকের হাসিঠাট্টা ও করতালির মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে চলল সহায় দম্পতির সেই ঝাঁঝালো প্রেম নিবেদনের পালা। তারপর পুষিকে দেখা গেল হস্তবিশারদ এক গণকের ভূমিকায়। চোপরার হাত দেখে চাঞ্চল্যকর সব ভবিষ্যৎবাণী শোনাতে লাগল সে। বাজোয়া ঢুকল ওমর খৈয়ামী ঢঙে। মুখে উর্দু শায়ের—উঠি হ্যায় মগরব সে ঘটা, পিনে কা মৌসম আ গায়া......

সব শেষে তাক লাগিয়ে দিলেন এক রাজস্থানী মহিলা। লম্বা ঘোমটা টেনে তিনি মিসেস জেকবকে ধরে ঘরের মধ্যে কলাবৌ হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুতেই ঘোমটা খুলবেন না। সবার অনুরোধে মিসেস জেকবই অবশেষে সেই লাজুক মহিলার আবরণ উন্মোচন করলেন। দেখা গেল মহিলাটি স্বয়ং স্কোয়ান লীডার দাশ। প্রকাণ্ড গোঁফের আড়ালে মিটমিটি হাসছেন। ধরা পড়ে যেতেই দারুণ স্মার্ট ভঙ্গিতে তিনি স্যালুট করলেন মিসেস জেকবকে। আর একবার হাসির হুল্লোড় বয়ে যায় ঘরের মধ্যে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল সেই আগন্তুকদের মিছিল। তারপর খানিক বিরতি। বিরতির পর নতুন প্রোগ্রাম। গান-বাজনা কৌতুকের আসর। মিসেস চক্রবর্তী বাংলা গান গাইলেন একটা। মূর্তি শোনালেন অ্যাকর্ডিয়ান বাজিয়ে। জেকবের অনুরোধে রিখি গাইলেন ইংরেজি গান। সুন্দর গলা রিখির। কিন্তু সুরটা বড় বিষণ্ণ। এই আসরের মেজাজের সঙ্গে যেন খাপ খায় না। তবুও সবাই মুগ্ধ হয়ে তাঁর গান শোনে।

ডেভিড নেশার ঘোরে এতক্ষণ ঝিম ধরে বসেছিলেন। তিনিও মগ্ন হয়ে গানটা শুনতে শুনতে বললেন—রিখি কিন্তু সত্যিই ভাল গায়, সানিথ। সুনীথ ঘাড় নেড়ে তাঁর কথার সমর্থন করে। ডেভিড বললেন—কিন্তু এই সব দুঃখের গানগুলো বড় সিক্‌লি লাগে, আনন্দের গানই আমার বেশি পছন্দ, তোমার?

সুনীথ ঠিক বুঝতে পারে না তার কোন্‌টা বেশি পছন্দ। সে হাসল—আমার বোধ হয় দুটোই পছন্দ, সার।

রিখির গানের পর পুরুষোত্তম উঠে ঘরের হালকা মেজাজটা আবার ফিরিয়ে আনল। আগের মতো উল্লাসের স্বর শোনা গেল শ্রোতাদের মধ্যে। বাজোয়ার মুখে সেই বিচিত্র শব্দ। মূর্তি চেঁচিয়ে উঠলেন—শাবাশ পুষি, শাবাশ!

নাচতে নাচতে পুষি গাইছিলঃ

ওয়ান্‌স্‌ এ পাপ্‌পো মেট এ মাম্‌মা
আনডার এ উইলো ট্রি—
দেন দ্য পাপ্‌পো আসক্‌ড দ্য মাম্‌মা
উইল য়্যু ম্যারি মী—
উইল য়্যু ম্যারি মী মাই ডার্লিং,
উইল য়্যু ম্যারি মী......

গানটা শুনে প্রায় পাগলের মতো হাসতে আরম্ভ করেছেন মিসেস সহায়। দু'চোখে নেশার ঘোর। ইতিমধ্যে কখন পোশাক বদলে এসেছেন। আঁট করে পরা সবুজ নাইলন শাড়ি। চোখে নতুন আইল্যাশ। পুষির নাচ দেখে হাসতে হাসতে প্রায় ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাতের ধাক্কায় দুটো গ্লাস উল্টে পড়ে টেবিলের ওপর।

সমস্ত রাত ধরে প্রোগ্রাম। সঙ্গে অঢেল পানীয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে আসর। দু'-চারজন বাদ দিলে প্রায় সবারই চোখ-মুখ লাল এখন। তারই মধ্যে চলছে নাচ, গান, আর নানা রকমের মজা।

ডিনারের ব্যবস্থা পাশের ঘরে। বুফে সার্ভিস। যে যার ইচ্ছেমতো খাবার তুলে নিয়ে খাবে। কিন্তু ও ব্যাপারে কারোরই খুব উৎসাহ দেখা গেল না। একমাত্র স্কোয়ান লীডার দাশই নিলেন প্রায় সব ক'টা আইটেম। পুষি আর বাজোয়াও মোটামুটি এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাল। ডেভিড খালি হাতে শুধু দুটো রোল নিয়ে ডিনার সারলেন। সুনীথও তাঁর দেখাদেখি শুধু একটা কাটলেট তুলে নেয়। রিখি এগিয়ে আসেন—ওকি সানিথ, আরও কিছু নাও তুমি। আপত্তি সত্ত্বেও আধ প্লেট ফ্রায়েড রাইস ধরিয়ে দিলেন তার হাতে।

ডেভিড বললেন—নেশাটা কাটাতে চাও তো এই বেলা পেট ভর্তি খেয়ে নাও। একটু পরেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

জয়দীপ প্লেট নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল একবার। তাকে বেশ স্বাভাবিক লাগছে আজ। সুনীথের বুকে ন্যাপকিনটা ভাল করে গুঁজে দিয়ে তার কানে কানে বলল—সাবধান, শার্টে দাগ লাগলে সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে দেখবে কিন্তু। সুনীথ হাসতে হাসতে ধন্যবাদ দেয় তাকে। মাথাটা বেশ ঘুরছে, তবু সে যতটা সম্ভব সহজ থাকবার চেষ্টা করে।

জয়দীপ তাকে টানতে টানতে একটা কোণের দিকে নিয়ে যায়—তুমি ফ্লাইং শুরু করেছ সুনীথ?

সে মাথা নাড়ে—না জয়, এখনো যাইনি ওদিকে। এইবার যাবো।

জয়দীপ চোখ নাচাল—তুমি এখনো দেখছি নার্ভাস হয়ে আছ, শুরু করো এবার, নাকি আবার অন্য কিছু ভাবছ?

—আমি কিছুই ভাবতে পারছি না, বিশেষত এখন।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সুনীথ। গভীর হয়ে এসেছে রাত। পিছনের বাগানটায় কালো জমাট অন্ধকার। তার মধ্যে এয়ারফোর্সের হ্যাঙ্গারের মাথায় জ্বলজ্বল করছে একটা লাল আলো। খানিকক্ষণ সেই দিকে দেখতে দেখতে বলল—হায়দ্রাবাদ থেকে আর কোন চিঠি পেয়েছ, জয়?

জয়দীপ একটু চমকালো—নো, আর হয়ত কোনদিনই পাবো না। ছেড়ে দাও ও প্রসঙ্গটা, লেট আস এনজয় নাউ।

ওরা আবার সরে আসে ঘরের মাঝখানে। পুষি এসে দাঁড়াল সামনে। সুনীথকে দেখে হাসল—হাউ আর য়ু এনজয়িং ফ্রেন্ড?

—ফাইন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

ডেভিড খাওয়া শেষ করে এখন জেকবের সঙ্গে গল্প করছেন। রিখিও তাঁদের সঙ্গে। মিসেস সহায় প্লেটের ওপর একটা আইসক্রীম নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে। গোয়েল তাঁকে হাসাচ্ছেন খুব। হাসির ধাক্কায় শরীরটা মুচড়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন সহায়। প্লেটটা হাত থেকে পিছলে যেতে যেতেও যাচ্ছে না। দেখলেই বোঝা যায় দুজনেরই বেশ বেসামাল অবস্থা এখন।

বাজোয়া ওদিকে জেফ্রির সঙ্গে গল্প মত্ত। জেফ্রির হাতে প্রকাণ্ড একটা আধ-খাওয়া আপেল। সেটা কামড়াতে কামড়াতে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে সে বাজোয়ার কথায় সাড়া দিয়ে চলেছে। একটা তীব্র উল্লাস আর মত্ততা তার চোখেমুখে। সুনীথ পায়ে পায়ে আবার জানলার কাছে সরে আসে।

ডিনারের পর আবার নাচের বাজনা। কিউবান রুম্‌বা নাচ শুরু হলো এবার। ডেভিড রিখির হাত ধরে এগিয়ে গেলেন ফ্লোরে। কিন্তু নাচতে পারলেন না ঠিকমতো। পা টলছে। দ্রুত তালের দুটো স্টেপিং-এর পর তৃতীয় স্টেপটা মেলে না। কখনো প্রথম দুটো জড়িয়ে যায়। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলেন। আর একটা বড় হুইস্কি নিয়ে বসে পড়লেন এসে। সুনীথকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—তুমি ঠিক আছ তো সানিথ, নাথিং রঙ?

নিজেকে সামলাতে পারছেন না, অথচ আবার ড্রিংক নিয়ে বসেছেন। তার মধ্যেও এই প্রশ্ন শুনে হাসি পায় সুনীথের। হাসতে হাসতে বলে—আমি

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্যর! কোয়াইট অল রাইট।

নাচের আসরটা এবার জমল না তেমন। সবাই কমবেশি এলোমেলো পা ফেলছে। একমাত্র জয়দীপই এখনো বেশ সুন্দর ভঙ্গিতে নেচে চলেছে। তার পার্টনার হিসেবে মিসেস সহায় রীতিমতো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। গোয়েলের কোন পার্টনার ঠিক ছিল না। তালও রাখতে পারছিলেন না বাজনার সঙ্গে। কেবল এলোমেলো চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ফ্লোরের মধ্যে। রিখি সামনে পড়ে যেতেই এবার তাঁকে সামনে রেখে খানিকক্ষণ খুব দাপাদাপি শুরু করলেন। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ চেহারা, যে-কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারেন! তবুও কোন হুঁস নেই। রিখি তাঁকে কোনমতে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলেন ক্রমাগত।

ডেভিড বললেন—গোয়েলের কাণ্ডটা দেখছ, দাঁড়াতে পারছে না, তবু নাচা চাই। এইবার দেখ, ঠিক ও মুখ থুবড়ে পড়বে ফ্লোরের মধ্যে—অ্যান্ড দে উইল কিক্ হিম আউট।

রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। ঘরটা আগের চেয়ে একটু ফাঁকা। ডিনারের পর থেকেই দু'-একজন করে যেতে আরম্ভ করেছে। যারা আছে, তারাও যেন ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে। গ্রুপ ক্যাপটেন কৌচে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে। সামনে গ্লাস। সেদিকে আর চেয়েও দেখছেন না। মূর্তি গল্প করে চলেছেন এক নাগাড়ে। মিসেস দাশ আর মিসেস মূর্তি সামনে বসে হাই তুলছেন ঘন ঘন।

স্কোয়াড্রন লীডার দাশ এসে মূর্তিকে কী যেন বললেন। মূর্তি উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। ঘড়ির দিকে একবার দেখে নিয়ে বললেন—বন্ধুগণ, এইবার একটা মজার খেলায় অংশ গ্রহণ করব আমরা। এবং এটাই আজ আমাদের শেষ আইটেম। আশা করি, খেলাটা সবাই উপভোগ করবেন।

খেলাটার নাম 'অলমাইটিজ উইশ'—ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বর এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর ইচ্ছেটা জানাবেন একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে। সবার সম্মতিক্রমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন মিসেস জেকব। তাঁর নাম হলো—কুইন অব দ্য পার্টি। তিনি এখন যা নির্দেশ দেবেন, সেইটেই হবে ঈশ্বরের অভিপ্রায়। নির্দেশগুলো অবশ্য দাশ এবং মূর্তি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে ছোট ছোট কাগজের টুকরোয় লিখলেন। তারপর সেগুলো একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে ফেলে ভাল করে ঘেঁটে দিলেন কুইন।

উজ্জ্বল আলোয় এবার সবাই গোল হয়ে বসে নিঃশব্দে সেই ঈশ্বরের আদেশের জন্যে অপেক্ষা করে। মূর্তি একটা করে কাগজের মোড়ক সবাইকে

বিলি করে গেলেন। নিজেও নিলেন একটা। কাগজগুলো আগে থেকে খুলবে না কেউ। যার যখন পালা আসবে, সে তখন কাগজটা খুলে সবাইকে শুনিয়ে ঈশ্বরের আদেশটা পড়বে এবং সেইমতো কাজ করবে।

মূর্তি ইঙ্গিত করলেন—লেট আস স্টার্ট নাউ। প্রথমেই গ্রুপ ক্যাপটেন জেকবের পালা। হাসতে হাসতে তিনি তাঁর কাগজটা পড়লেনঃ স্ট্যান্ড ইন ওয়ান লেগ অ্যান্ড কাউন্ট ফিফটি—এক পায়ে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশ গোনো।

দাশ দরবার করলেন মিসেস জেকবকে—ম্যাডাম, পঞ্চাশ নয়, আমাদের স্টেশান কমানডারকে একটু কনসেশান করা হোক।

—নো—কুইন মাথা নাড়লেন—ঈশ্বরের ইচ্ছে আমি পালটাতে পারি না। অগত্যা জেকব সবার মাঝখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গুনতে লাগলেনঃ ওয়ান, টু, থ্রি......

পঁচিশ পর্যন্ত হলে মিসেস হেসে বললেন—ঠিক আছে, আর গুনতে হবে না তোমায়।

কুইনকে ধন্যবাদ দিয়ে গ্রুপ ক্যাপটেন জায়গায় ফিরে যান।

স্কোয়ান লীডার মূর্তির কাগজে উঠলঃ বিবাহিত জীবন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, আমাদের বলো। লেখাটা পড়ে মূর্তি একগাল হাসলেন। বললেন—এটা খুবই জটিল আর সূক্ষ্ম বিষয়। তবু আমি এর সামান্য যেটুকু বুঝেছি, তা আপনাদের জানাই।

—ভদ্রমহিলাবৃন্দ অপরাধ নেবেন না; আমার মনে হয় এ সম্পর্কে যা বলার তা বহুকাল আগেই শেক্সপীয়ার তাঁর তিনটি নাটকের মাধ্যমে বলে দিয়ে গেছেন। দেখুন, বিয়ের আগে যে ব্যাপারটাকে মনে হয় 'এ মিডসামার নাইটস্ ড্রিম', বিয়ের পরই সেটা হয়ে ওঠে 'দি টেমপেস্ট'; এবং তারপর যত দিন যায় কেবলই মনে হতে থাকে, হায়! এ যে 'মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং'......

মূর্তি দু'দিকে দু'হাত মেলে একটা অসার ভঙ্গি দেখিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

তুমুল হাততালি আর হাসির শব্দে ভরে যায় ঘরটা। গ্রুপ ক্যাপটেন ঝিমোতে ঝিমোতে হেসে ওঠেন হা-হা করে। সেই প্রবল হৈ-হট্টগোলের মধ্যে মিসেস মূর্তির গলা শোনা যায়—অবজেকশান কুইন, আমি প্রতিবাদ করছি।

মিসেস সহায়ের কাগজে উঠল একটা কবিতা আবৃত্তির নির্দেশ। জড়িয়ে যাওয়া চোখ দুটো টান করে একটা বাচ্চাদের ছড়া আবৃত্তি করে শোনালেন তিনি। বাজোয়াকে করতে হল নিজের চরিত্র সমালোচনা। তারপর রিখির পালা।

কাগজটার ওপর একবার চোখ বুলিয়েই থেমে গেলেন রিখি—ও গড্! অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ গড় গড় করে পুরোটা পড়ে শোনালেনঃ তোমার নিকটতম সঙ্গীকে একটা চুমু উপহার দাও।

চারিদিকে একটা চাপা গুঞ্জন। রিখি জড়ানো দৃষ্টিতে একবার তাকালেন দু'পাশে। সুনীথ তাঁর সবচেয়ে নিকটে বসে। হঠাৎ তার হাতটা টেনে ঠোঁটের সঙ্গে ছুঁইয়ে আবার ছেড়ে দিলেন।

মিসেস মূর্তি হাততালি দিয়ে উঠলেন—ওয়েল ডান, রিখি, ওয়েল ডান। গোয়েলের গলায় প্রতিবাদ—নো, এটা কিছুই হল না। আমরা একটা রিয়েল কিস দেখতে চাই।

কুইন বললেন—এটাই যথেষ্ট।

মূর্তিও তাঁকে সমর্থন করলেন।

চারদিকে তখনো চিৎকার, চেঁচামেচির শব্দ। সুনীথ মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে। সে কারো দিকে তাকাতে পারছিল না। মাথার মধ্যে যেন একটা প্রবল ঘূর্ণি। আর তার সঙ্গে ঝিঁঝির ডাকের মতো একটা শব্দ তার সারা শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল।

গোয়েলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বাঁধা অবস্থায় ঘুরতে হবে। যদি কারো সামনে দাঁড়িয়ে অথবা স্পর্শ করে তিনি তার নামটা ঠিক ঠিক বলতে পারেন, তবে সেই তাঁর চোখ খুলে দেবে। মূর্তি তাঁর চোখের ওপর একটা রুমাল বেঁধে দু' পাক ঘুরিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন সবার মাঝখানে। গোয়েল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন প্রথমে। তারপর দুলতে দুলতে রিখির সামনে এসে কয়েকটা লম্বা নিশ্বাস টেনে ঘ্রাণ নিয়ে বললেন—রিখি, প্লীজ হেল্প্ মী।

এত তাড়াতাড়ি গোয়েলের অন্ধত্ব ঘুচে যাওয়াটা অনেকেরই পছন্দ হয় না। দাশ বললেন—আর একবার করতে হবে, ও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য দাশের আপত্তি টিকল না। কারণ, ওদিকে ফ্লাইট লুট সহায় তখন কার্পেটের ওপর গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছেন। মিসেস সহায়েরও অবস্থা সঙ্গীন। তাঁদের দু'জনকে ধরে জয়দীপ আর বাজোয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আসরটা আরও ফাঁকা হয়ে এল আস্তে আস্তে। গ্রুপ ক্যাপটেন বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়লেন এবার। তার মধ্যেও খেলাটা চলতে লাগল।

ডেভিডকে বলা হল এবার তাঁর কাগজটা পড়তে। অনেকক্ষণ থেকেই

ঝিম ধরে বসে আছেন তিনি। চোখ দুটো বুজে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। নাম ধরে ডাকতেই চোখ মেলে উঠে দাঁড়ালেন। কাগজটা পড়লেন। একটা গান গাইতে হবে তাকে। নিজেই হো-হো করে হাসলেন লেখাটা পড়ে। তারপর ভাঙা গলায় হাসতে হাসতে গান ধরলেন। বিচিত্র সে গানের কথাঃ য়ু ক্যান নট গো টু হেভেন ইন এ জেট ভাম্পায়ার...অর য়ু ক্যান নট গো টু হেভেন ইন এ লেডিস আর্ম...

গান থামিয়ে আবার হাসতে লাগলেন। পায়ে পায়ে জড়িয়ে টলে ওঠে শরীরটা। হাত বাড়িয়ে গোয়েল তাঁকে ধরে ফেলেন—বী স্টেডি, ডেভিড।

ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হয় না ডেভিডের। চোখ পাকিয়ে বললেন—লীভ মী অ্যালোন, বলছি আমাকে ছেড়ে দাও।

রিখি সুনীথের হাত ধরে নাড়া দিলেন—কাম অন সানিথ, চল আমরাও উঠে পড়ি এইবার। ডেভিডের অবস্থাটা দেখছ, এরপর ওকে সামলানো মুশকিল হবে।

কিন্তু ডেভিডকে রাজী করানো যায় না। বলে ওঠেন—কেন? এখনো তো পার্টি চলছে—এর মধ্যে চলে যাবো কেন?

রিখি অগত্যা সুনীথকে দেখিয়ে বললেন—ও খুব অসুস্থ বোধ করছে, এখন আমাদের যাওয়া উচিত, ডেভ।

—আই সী, কিছু ভেব না সানিথ, সব ঠিক হয়ে যাবে। চল তাহলে যাওয়া যাক।

কিন্তু এক পা এগোতে গিয়ে দু' পা পেছিয়ে আসেন তিনি। মূর্তি এবার এগিয়ে এসে তাঁকে ধরলেন। ডেভিড বললেন—মূর্তি, আমাকে কি ড্রাংক মনে হচ্ছে?

—নো ডিয়ার, নট অ্যাট অল, এতে কিছুই হয় না তোমার। মূর্তি তাঁর পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দেন।

গাড়িতে উঠে তিনি হঠাৎ আবার গোয়েলকে গালাগালি দিতে শুরু করলেন—ব্লাডি গোয়েল, একটা স্কাউন্ড্রেল, ওকে একদিন দেখে নেব আমি। রিখি, তুমি এবার থেকে এড়িয়ে চলবে ওকে। আমি একদম পছন্দ করতে পারি না শয়তানটাকে।

রিখি ডেভিডের পিঠে হাত রাখেন—ঠিক আছে ডেভ, তাই হবে।

তীব্র বেগে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়িটা ছুটিয়ে নিয়ে যায় ড্রাইভার। ভোর রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে চোখ বুজে আসে ডেভিডের। দু'জনের মাঝখানে সীটে হেলান দিয়ে একটু পরেই যেন ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। তাঁর ঘর্মাক্ত

শরীরটা গাড়ির ঝাঁকুনিতে এক-একবার সুনীথের গায়ের ওপর গড়িয়ে আসে। নিজেকে আরও শক্ত করে তাঁর দেহের সঙ্গে চেপে রাখে সে।

গাড়িটা যখন কোয়ার্টারের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন ডেভিড গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। চারদিকে শেষ রাত্রির নিস্তব্ধতা। বাগানে গাছপালার মধ্যে জোনাকি জ্বলছে থোকা থোকা। গাছের আড়ালে মার্কারি ল্যাম্পের আলোটা জ্যোৎস্নার মতো ঝাপসা নীল।

ঘুম ভাঙিয়ে অনেক কষ্টে ডেভিডকে গাড়ি থেকে নামালেন রিখি। চোখ-মুখ আরও ফুলে উঠেছে। দাঁড়াতে পারছেন না ঠিকমতো। ঘুমচোখে দু'জনের কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে বাগানটা পেরিয়ে চললেন। বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন এবার—সানিথ, তুমি এখন আমার গাড়িটা নিয়ে চলে যাও। টেক রেস্ট অ্যান্ড গেট এ গুড শ্লীপ নাউ—সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাগান পেরোতেই কুকুরটা তাদের সাড়া পেয়ে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে আসে। রিখি বেয়ারাকে ডাকলেন। দরজা খুলে সে এগিয়ে এসে ডেভিডকে ধরল। রিখি বললেন—একটু অপেক্ষা করো সানিথ, আমি আসছি। ডেভিডকে ধরে শোবার ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন তিনি।

সুনীথ দাঁড়িয়ে থাকে। ঝিরঝিরে ঠান্ডা হাওয়া চারদিকে। এখানেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে তার। মুখের মধ্যে একটা বিস্বাদ অনুভূতি, গলাটা শুকিয়ে কাঠ। হাঁ করে লম্বা নিশ্বাস টানল কয়েকবার। জ্যোৎস্নার মতো মার্কারি আলোয় গাছগাছালির মাথাগুলো বাতাসে নাচের ভঙ্গিতে নুয়ে পড়ে। জোনাকিগুলো সার বেঁধে যেন ডাইভ দিয়ে পড়ছে তার চোখের সামনে। দিনের আলোর আভাস পেয়ে ওরা বোধ হয় শেষবারের মতো মাতামাতি করে নিচ্ছে। ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সোজা তাকিয়ে দেখছিল সব।

ঝাউগাছের পাতায় শিরশির করা হাওয়ার শব্দ। চাপা বৃষ্টির মতো আওয়াজ। একটা অদ্ভুত অস্থিরতা যেন টান টান হয়ে তার সারা শরীর জুড়ে কাঁপে। রিখি এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। লাল রঙ্গন ফুলের মতো পোশাক পরা রিখি। কী যেন বলছেন তিনি। অনেক দূর থেকে কথা বলার মতো মৃদু শব্দ। ঝাপসা দৃষ্টিটা প্রখর করে সুনীথ তাঁকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করে। অন্ধকার থেকে আবছা জ্যোৎস্নার মধ্যে হেঁটে আসছেন তিনি।

—সানিথ, তোমার যেতে কোন অসুবিধে হবে না তো?

আরও কাছে এগিয়ে এলেন রিখি। লাল চোখ। মাথার চুলগুলো এলো-

মেলো। আলগা হয়ে যাওয়া লাল জামার মধ্যে কুচকুচে কালো ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ। ধবধবে নরম দেহটাকে যেন কামড়ে ধরে আছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে সুনীথ। রিখি হাসলেন। টলটলে রঙিন চোখ। প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধ। হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলেন রিখি। ফিসফিস করে বলে উঠলেন—ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক সানিথ।

পরক্ষণেই রিখির উষ্ণ নরম ঠোঁট দুটো তীব্র আবেগে তার ঠোঁটের ওপর চেপে বসে যায়।

কোথা থেকে একটা অজানা ভয় শিউরে উঠতে থাকে যেন শরীরের মধ্যে। সে থরথর করে কাঁপে। মাথার মধ্যে ঘূর্ণিটা দুরন্ত বেগে টাল খেয়ে তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলতে চায়। সে দু'হাতে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রিখিকে।

গভীর আলিঙ্গনে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে তারা সেইভাবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঝড়ের মতো দমকা হাওয়া তাদের মাথার ওপর দিয়ে সমানে হু-হু করে বয়ে যায়।

রিখি হঠাৎ ছাড়িয়ে নিলেন নিজেকে—এইবার তুমি বাড়ি যাও সানিথ, প্লীজ গো!

সুনীথ অবাক হয়ে তাঁকে দেখে। এখনো বুকের মধ্যে তরল অগ্নিস্রোতের মতো তাঁর দেহের স্পর্শ। অনেক কষ্টে সে উচ্চারণ করে—গুড নাইট ম্যাডাম—

—গুড নাইট, সানিথ—

জ্যোৎস্নার মধ্যে এখনো রিখির শরীরটা কাঁপছে। তাঁর দিকে তাকিয়ে একবার মৃদু হাসতে চেষ্টা করল সুনীথ। তারপর অবশ শরীরটাকে টানতে টানতে ফিরে যায় রাস্তার দিকে।

ড্রাইভার গেটের বাইরে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাকে ফিরিয়ে দিল সুনীথ। এখন খোলা মাঠের মধ্যে একা একা খানিক হেঁটে বেড়াবে সে। একটা অবাস্তব স্বপ্নের মতো দৃশ্যগুলো তার উত্তেজিত মস্তিষ্কের মধ্যে যেন উথাল-পাথাল হয়ে ঘুরছিল।

দশ

মধ্যরাত্রির পর অনেকক্ষণ একটানা বৃষ্টি হয়ে গেল কাল।

ঘুমের মধ্যে জেগে উঠে সুনীথ বৃষ্টির শব্দ শুনছিল। বৃষ্টি আর ঝড়। মেঘ ডাকছিল কড়-কড় করে। খ্যাপা হাওয়ায় ঘরের জানলাগুলো দুদ্দাড় করে বন্ধ হয়ে আবার খুলে যাচ্ছিল। দেওয়ালটা নীলচে আলোয় চমকে উঠছিল ঘন ঘন। সেই ঝড়-বৃষ্টি মেঘগর্জনের মধ্যে অনেক দূরে কোথাও এক বিপন্ন এয়ারক্র্যাফ্টের শব্দ শুনতে পায় সে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আর্তনাদ করতে করতে হয়ত কোন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে চলেছে প্লেনটা।

এই ঝড়ের মুহূর্তে সে একবার ক্লাবের বিমানবন্দরের চেহারাটা কল্পনা করে। রানওয়ে ভাসছে থৈ থৈ জলে, কণ্ট্রোল টাওয়ার ঘন বৃষ্টির আড়ালে ঝাপসা, পলাশ-পাকুড়ের জঙ্গলে কী ক্রুদ্ধ হাওয়ার মাতামাতি! দিগন্তরেখা বৃষ্টির সমুদ্রে একাকার। বড় ভয়ংকর মুহূর্ত এখন। মাটিতে নামতে আসা বিমানের জন্যে যেন চারদিকে বিপদ ওত পেতে বসে আছে।

অথচ ঝড়-বৃষ্টি থামলে এই হিংস্র পরিবেশটাই আবার কী শান্ত নিঝুম হয়ে উঠবে। নরম ঘাসের বিছানায় নির্জীব হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোবে বিশাল রানওয়েটা। মৃদু বাতাসে কণ্ট্রোল টাওয়ারের মাথায় কুল কুল শব্দ উঠবে হাওয়া মাপার অ্যানিমোমীটারে। আকাশে ভেসে পড়ার এক আদর্শ মুহূর্ত ফিরে আসবে আবার।

দৃশ্যটা ভাবতে ভাবতে কেমন উত্তেজিত বোধ করে সে। অনেকদিন হল এই সুন্দর ছবিটা চোখে পড়েনি। ঠিক করল কাল সকালেই একবার বিমান বন্দরের দিকে যাবে। ভাল আবহাওয়া পেলে সকালের আকাশে উড়ে বেড়াবে কিছুক্ষণ।

কয়েকদিন হল কাকা তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোচ্ছেন। ব্যবসার কাজকর্ম শিখিয়ে দিচ্ছেন একটু একটু করে। তাদের এজেন্সীর সঙ্গে যুক্ত কয়েকটা কারখানার কমারশিয়াল ম্যানেজারদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছেন। বেশ উৎসাহ নিয়েই সে সবকিছু বুঝতে চায়। তার আগ্রহ দেখে কাকাও খুব

খুশি। কিন্তু মাঝে মাঝে কী যেন হয়; কিছুই আর ভাল লাগে না। আচমকা একটা জ্বালা ধরানো অনুভূতি কেমন নিরুৎসাহ করে ফেলে তাকে।

এইসব সময় বিশেষ করে তার ফ্লাইং ক্লাবের কথা মনে হয়। বিমান বন্দরের খোলা আকাশ, নানা ধরনের এরোপ্লেনের অবিরাম ওঠানামা, হাওয়ায় ভেসে থাকা মেশিনের থরথরানি অদৃশ্য আকর্ষণের মতো যেন টানতে থাকে। এয়ারক্র্যাফ্‌ট নিয়ে আকাশে ঘোরার একটা তীব্র ইচ্ছে তখন তাকে পেয়ে বসে।

ডেভিডের নির্দেশমতো এর মধ্যে মাত্র একদিন সে গিয়েছিল ক্লাবে। তাকে আসতে দেখে যথারীতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি—ও সানিথ, তুমি এসে গেছ, ভেরি গুড। চলো একটা সর্টি উড়ে আসা যাক—কী, উড়বে তো?

সুনীথের মনে হল, ডেভিডের গলায় যেন অন্য এক সুর। তাঁর নির্দেশ দেওয়ার পরিচিত ভঙ্গি থেকে এই আহ্বান যেন একটু আলাদা। ফ্লাইং করাটা যেন তার পক্ষে আর তত জরুরী নয়। খানিকটা উৎসাহ দেবার জন্যেই তাকে একবার আকাশে ঘুরিয়ে আনতে চান তিনি। তার মুষড়ে পড়া হতাশ ভাবটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে বুঝি এটা দরকার।

চারিদিকে তাকিয়ে সুনীথ একবার রিখিকে খুঁজল। তিনি আসেননি ক্লাবে। একটু যেন নিশ্চিন্ত হল সে। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ভেবে মনে মনে একটা অদ্ভুত ভয় ছিল। সেই রাত্রির অভাবনীয় অভিজ্ঞতার পর তাঁর সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি। ভেবেই পাচ্ছিল না, এর পর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কী ভাবে ঠিক আগের মতো কথা বলবে। পরদিন দিনের আলোয় সব কথা মনে পড়তেই সে লজ্জায় সংকোচে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিল। সেই থেকে মৃদু একটা আশঙ্কার মতো ঘটনাটা তাকে কেমন আড়ষ্ট করে রেখেছে।

কক্‌পিটে বসেও তার আড়ষ্টতা কাটতে চায় না। হারনেস বেঁধে, পুরো থ্রটল বাড়িয়ে দিয়ে ইঞ্জিনের তীব্র গর্জনের মধ্যে কান পেতে রইল সে।

ডেভিড নিজেই টেক অফ করলেন সেদিন। পাঁচ হাজার ফুট মতো উঁচুতে উঠে তাকে কন্ট্রোল স্টিক ছেড়ে দিয়ে বললেন—এবার তুমি চালাও। সে স্টিক ধরে সোজা উত্তর মুখে উড়ে চলল। সারা আকাশ আবার ভরে ওঠে ডিয়ারের গর্জনে। হাতের মুঠোয় কন্ট্রোল স্টিকটা টলমল করে কাঁপে। ডেভিড বললেন—হাউ আর য়ু ফীলিং মাই বয়—কেমন লাগছে তোমার সানিথ?

সুনীথ উত্তর দিতে পারে না। মাথার ওপর অসীম শূন্য। হা-হা করা খোলা হাওয়ার মাতামাতি। চোখের সামনে ঝাপসা দিগন্ত, বিষণ্ণ করুণ। সে বলতে চাইল—ফাইন! খুব ভাল লাগছে আমার, খু-উ-ব! কিন্তু ইঞ্জিনের প্রচণ্ড থরথরানি এক অদ্ভুত নেশায় অভিভূত করে রাখে তাকে। প্লেনটা যেন

তার বুকের মধ্যে দিয়ে গুর গুর করে উড়ে যায়।

ডেভিড আয়নার মধ্যে তাকে দেখছেন। এক গম্ভীর সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি। মেডিক্যাল বোর্ড যাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, যার বুকের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে চলেছে এক দুর্বোধ্য শব্দ, সেই সুনীথকে হয়ত আকাশে উঠে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করছেন। যার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্পর্কে একদা নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি, বোর্ডের বিচারে সে এখন একজন সন্দেহজনক প্রার্থী। বৈমানিকের জীবন বেছে নেওয়া যার পক্ষে এখন এক বিপজ্জনক ঝুঁকি, সেই তাকে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন তিনি। প্রতিটি মুহূর্তে জানতে চাইছেন তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা।

মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার ধাক্কায় লাফিয়ে উঠছিল মেশিনটা। নেমে আসছিল এয়ার পকেটের শূন্য গহ্বরে। অলটিমিটারের কাঁটাটা অস্থির। অনেকক্ষণ একই নিশানায় ওড়ার পর এবার বাঁদিকে বাঁক নেয় সুনীথ।

নিচেয় একটা বাতিল হয়ে যাওয়া বিমান অবতরণের মাঠ। ঘাসে বুজে যাওয়া এয়ার স্ট্রিপ। ফোর্স ল্যান্ডিং প্র্যাকটিস করার জন্যে মাঠটাকে ক্লাবের পাইলটরা কখনো কখনো ব্যবহার করে। হঠাৎ কী ভেবে সে নিচেয় নামতে শুরু করল। মাত্র তিনশো ফুট ওপরে থেকে সেই মাঠের চারদিকে ঘুরতে লাগল। ডেভিড একটু অবাক হয়ে তাকে লক্ষ করেন। কয়েকটা চক্কর কাটার পর শক্ত হাতে কণ্ট্রোল ধরে বললেন—চলো, এবার ফেরা যাক।

বিমান বন্দরের সারকিটে ফিরে এবার যথেষ্ট সতর্ক হয়ে সে রানওয়ের ওপর নামতে থাকে। ডেভিড তাকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিলেন—ঠিক আছে, দ্যাটস রাইট, ভেরি গুড—। তবুও সে ঠিক স্বাভাবিক হতে পারছিল না। নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে ভাসতে ভাসতে নেমে আসছিল মাটিতে।

শেষ পর্যন্ত খুব মসৃণভাবে নামান গেল না প্লেনটাকে। রানওয়ে ছুঁয়েই একবার বেলুনের মতো শূন্যে ভেসে উঠতে চাইল। তারপর কয়েকটা বিশ্রী ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা ছুটতে থাকল। ডেভিড নিজেই কণ্ট্রোল করতে লাগলেন এবার। এ রকম ল্যান্ডিং দেখে তাঁর রীতিমতো রেগে উঠবারই কথা। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না আজ।

পরে মেশিন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—হোয়াই সানিথ, এমন নার্ভাস হয়ে আছ কেন? নিশ্চয়ই সেই বিদঘুটে ভাবনাগুলো ঘুরছে তোমার মাথায়। ফরগেট ইট মাই ফ্রেন্ড—আমি বলছি ভুলে যাও ওসব। তোমার ফ্লাইং করার সঙ্গে ওর কোনই সম্পর্ক নেই। আমার ধারণা তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ। এবং এখনো এখানকার ছেলেদের মধ্যে তুমি বেস্ট ফ্লায়ার। ওয়েক আপ সানিথ, য়ু

ওয়েক আপ।

কথা বলতে বলতে তার কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিচ্ছিলেন তিনি। সুনীথের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠছিল। সে জানে এগুলো সব সত্যি নয়। তবু তার শরীরে শিহরন বয়ে যায়। হয়ত তার মনে আবার উচ্চাশা জাগিয়ে দেবার জন্যেই এসব বলছেন ডেভিড। এই নির্জীব অবসন্নতার খোলসটা ভেঙে দিয়ে হয়ত তাকে আবার উত্তেজিত করে তুলতে চান তিনি।

রিখির কথাটা মনে আসে হঠাৎ। রিখিও তো জানেন তার মনের এই অবস্থার কথা। তিনিও কি তাহলে সেদিন তাকে জাগিয়ে দেবার জন্যে অমন একটি আশ্চর্য উপহার দিয়েছিলেন? নাকি এটা পার্টির সেই মজার খেলাটার একটা অংশ মাত্র? কে জানে! এর উত্তর পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। গোপন এক যন্ত্রণার মতো প্রশ্নটা তাকে বিন্ধ করতে থাকে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমান বন্দরটা ক্রমশ জমজমাট হয়ে ওঠে। ঝড়ের মতো আওয়াজ তুলে ফাইটার উঠল একখানা আকাশে। বাইরে থেকে নামল এসে একখানা প্রকাণ্ড প্যাকেট প্লেন। মাথার ওপর ড্যাক উড়ছে লোকাল ফ্লাইটে। চীফ ইনস্‌ট্রাকটার মিঃ ব্যানার্জী উড়ছেন এল ফাইভ নিয়ে। নানা ধরনের মেশিনের তীব্র গর্জনে গমগম করতে থাকে ফ্লাইং ক্লাবের আকাশটা। সুনীথের মনে হচ্ছিল, এ-সবের সঙ্গে তার আর কোন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। ক্লাবের বাড়িঘর, কণ্ট্রোল টাওয়ার, রানওয়ে, মাঠ, এমন কি তার প্রিয় টাইগার মথ ডিয়ার—সব কিছু থেকেই সে যেন দূরে সরে যাচ্ছে এবার।

অবশেষে বেশ কিছুক্ষণ এয়ারপোর্টে বসে থেকে ডেভিডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চলল সুনীথ। ডেভিড হাত বাড়িয়ে বললেন—কাম এগেন।

সে মাথা নাড়ল—রাইট, সার।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরতে ফিরতে তার মনে হয়েছিল, এভাবে ফ্লাইং করার কোন অর্থ হয় না। তারপর থেকে আর একদিনও সে যায়নি ওদিকে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই সুনীথ উঠে বসে আকাশটা দেখল। মেঘের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। ধোয়ামোছা পরিষ্কার আকাশ। চারদিকে একটা নিস্তব্ধ ভাব। খুব সুন্দর সকাল। ফ্লাইং ক্লাবে যাবার কথা ভেবে সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সূর্য উঠবার আগেই দ্রুত প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

বিমান বন্দরের কাছে পৌঁছোতেই দেখল সোনালী আলোয় ভরে উঠেছে চারদিক। পলাশপাতায় এখনো গত রাত্রির বৃষ্টির চিহ্ন। ভিজে বুনো গন্ধ

ভাসছে বাতাসে। নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্যে একটা ঘুঘু ডাকছে কোথাও। ডানদিকের মাঠে একটা ভাঙাচোরা এয়ারক্র্যাফ্‌টের ফিউসেলাজ। চড়ুই পাখি বাসা বেঁধেছে তার মধ্যে। চিঁপিক্‌ চিঁপিক্‌ করে মেশিনটার ভগ্নস্তূপের ওপর নেচে বেড়াচ্ছে সেই চড়ুই পরিবার।

আর একটু এগিয়ে দেখতে পেল, ফ্লাইং ক্লাবে আজ খুব ভিড়। অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে পর পর। ক্যাপটেন মৈত্র এসেছেন সপরিবারে। চীফ ইনস্‌ট্রাকটার মিঃ ব্যানার্জীর ঘরভর্তি লোক। ক্যান্টিনের বারান্দায় মিঃ চৌধুরী আর দাশগুপ্ত। তাদের এক পাশে রিখি, বারান্দার রেলিং ধরে রানওয়ের দিকে তাকিয়ে।

নিচের মাঠে সলিল দাশ আর জয়ন্ত গল্প করছে গ্রাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার গাঙ্গুলীর সঙ্গে। গাঙ্গুলী সাহেবের পাশে তাঁর মিসেস।

কন্ট্রোল টাওয়ারের সামনে দু'খানা টাইগার মথে তেল ভরা হচ্ছে। সেখানেও একটা জটলা। ডেভিডের মাথা দেখা যায় তাদের সবার ওপরে।

চারদিকে একটা ব্যস্ততার চিহ্ন। সুলতান, মাসুদ, মকবুল সবাই ছুটোছুটি করছে এদিকে ওদিকে। সুনীথ ঠিক আন্দাজ করতে পারে না, কী কারণে আজ সাতসকালেই এত ভিড় এখানে। ছুটির দিনে অবশ্য পুরনো মেম্বারদের অনেকে আসেন। কিন্তু নারী-পুরুষ মিলিয়ে একসঙ্গে সকালবেলায়ই এত ভিড় স্বাভাবিক নয়।

ক্লাবের পুরনো মেম্বার কমারশিয়াল পাইলট ধ্রুব দত্ত আসছে স্কুটার হাঁকিয়ে। চোখে প্রকাণ্ড মারকারি গগল্‌স্‌। পিছনের সীটে মাথায় সবুজ স্কার্ফ বাঁধা একটি মেয়ে। সম্ভবত তার বান্ধবী। ফ্লাইং শেখা শুরু করার প্রথম দিকে ধ্রুব দত্ত তাকে নিয়ে একদিন ক্রস কান্ট্রি ফ্লাইং-এ গিয়েছিল। একটানা দীর্ঘ বিমান যাত্রার সেই প্রথম অভিজ্ঞতা সুনীথের। অনেকদিন পর তাকে দেখে সুনীথ হাত নেড়ে রাস্তা ছেড়ে দিল।

দত্ত তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে একবার থামল—কেমন আছ সুনীথ?

সুনীথ হেসে জবাব দেয়—ভাল। আপনি?

দত্ত কাঁধ দুটো একবার উঁচু করে নামিয়ে নেয়—এই চলছে—জাস্ট পুলিং অন—

পিছনের মেয়েটিকে খুব সুন্দর দেখতে। সেদিকে একবার না তাকিয়ে পারে না সুনীথ। দত্ত হেসে আলাপ করিয়ে দিল—ইনি নীপা সেন, ভূবিজ্ঞানে বিশারদ, আমাকে খুব স্নেহ করেন এবং—মানে—

বলতে বলতে হেসে উঠল দত্ত। নীপা সেনের চোখেমুখে একটা লজ্জার

ভাব, ভ্রূ কুঁচকে সে চোখ পাকায় দত্তর দিকে।

—ধ্রুবদা, আজ কী ব্যাপার ক্লাবে? এত লোকজন? সুনীথ প্রশ্ন করে।

—সে কী, জান না? তুমি আসছ না আজকাল ক্লাবে?

—না, মানে অনেকদিন আসিনি। সুনীথ আমতা আমতা করে।

স্কুটারে স্টার্ট দিল দত্ত। একটা পা মাটিতে রেখে বলল—মীটিং আছে একটা, আসছে শনিবার ক্লাবের জন্মদিন। এবার মিঃ ব্যানার্জী আর স্কোয়াড্রন লীডার ডেভিড অ্যারোব্যাটিকস্ করবেন, তারও মহড়া আজ। স্বয়ং গুরুদেবদের বিমান মহড়া, ভিড় তো একটু হবেই—

একটা টাল খেয়ে দত্তর স্কুটার ছুটতে লাগল। সুনীথের মনে হল সে খুব ভাল দিনেই এসে পড়েছে। ডেভিডের বিমান মহড়া একটা দেখার জিনিস। মেশিনটা এই সময় দম দেওয়া একটা খেলনার মতো হয়ে যায় তার হাতে। প্রায় অকল্পনীয় দুঃসাহসিকতায় প্লেনটাকে মাটির কাছাকাছি এনে ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে মুচড়ে উল্টে, সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন তিনি। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

রানওয়ের মাত্র তিরিশ-চল্লিশ ফুট ওপর দিয়ে প্লেনটাকে উল্টে ফেলে স্বচ্ছন্দে ইনভার্টেড ফ্লাইং করে যেতে পারেন। নিচেয় দাঁড়িয়ে তখন পরিষ্কার দেখা যায় বেল্ট বাঁধা তাঁর শরীরটা সীট থেকে আলগা হয়ে ঝুলছে। দৃশ্যটা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলে যে কোন সাহসী লোকেরও বুক কেঁপে ওঠে। অথচ ডেভিড একাদিক্রমে কয়েকবার এই দুঃসাহসিক কৌশলটা দেখাতে পারেন। অসাধারণ আত্মবিশ্বাস তাঁর। তুলনায় মিঃ ব্যানার্জীর অ্যারোব্যাটিকস্ অনেক সতর্ক ও সাবধানী। মেশিনটাকে নিয়ে ডেভিডের মতো ডেয়ার ডেভিল হয়ে ওঠেন না কখনো।

ডেভিড তাকে নিয়ে অনেকদিন স্পিন করেছেন। একটা সরল রেখার চারদিকে পাক খেয়ে সাঁই সাঁই করে মাটির দিকে নেমে আসে প্লেনটা তখন। সমস্ত শরীরটা হাল্কা হয়ে বুক থেকে একটা বমি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। তবু শেষের দিকে সেটা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 'ইনভার্টেড ফ্লাইং'-এর অভিজ্ঞতাটা আরও সাংঘাতিক। বেল্ট বাঁধা—শরীরটা ঝুলছে শূন্যে. মনে হয় যে কোন মুহূর্তে ছিটকে পড়বে বুঝি। মাথার মধ্যে একটা তুমুল ঝড় বয়ে যায় যেন।

ইচ্ছে ছিল, সেও একদিন ডেভিডের মতো অ্যারোব্যাটিকস্ করবে। কথাটা মনে হতেই একটা ভারি নিশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক থেকে। জঙ্গী বিমান ওড়ানোয় এই কৌশলগুলো তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

রিখি তাকে দেখতে পেয়েই দূর থেকে হাত নাড়লেন—সানিথ, কাম হিয়ার—চলে এস এখানে। হাসছেন তিনি তার দিকে তাকিয়ে। সরল স্নিগ্ধ হাসি। কোন জড়তা নেই তাঁর আচরণে।

চাপা অস্বস্তিটা থেকে হঠাৎ যেন মুক্তি পেয়ে যায় সুনীথ। নির্ভার এক আনন্দের আবেগে ভরে ওঠে তার মন। মুগ্ধ চোখে সসম্ভ্রমে তাঁকে অভিবাদন করে—গুড মর্নিং ম্যাডাম।

রিখি বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তাকে দেখে—আমি আজ তোমার কথাই ভাবছিলাম সানিথ, তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। ডেভিড অ্যারোব্যাটিকস্ করবে আজ, জানো তো? ইস্, কয়েকদিন আগে এলে না, তাহলে ডেভিড নিশ্চয়ই তোমাকে সঙ্গে নিত। ও তো দাশগুপ্তকে নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে ফেলেছে এখন।

সুনীথ কপালে টোকা দিল—ব্যাড লাক, আগে জানলে হত।

—কী করে জানবে? তুমি তো আসছই না এদিকে, কী করছ আজকাল?

—তেমন কিছুই নয়, তবে চেষ্টা করছি কিছু একটা করতে। আমাদের একটা বিজনেস আছে জানেন তো, সেটাই একটু-আধটু দেখছি আপাতত।

—আ—তুমি ফ্লাইং ছেড়ে দিচ্ছ তাহলে?

—এখনো জানি না, তবে ছাড়তে চাইলেই পারব কি? সন্দেহ হয়—

সুনীথ হাসতে চেষ্টা করে। কেমন বিষণ্ন দেখাল তার মুখ।

—কিন্তু ফ্লাইং-এ তো তোমার বাধা নেই, ইচ্ছে হলেই তো তুমি উড়তে পার—

—পারি, কিন্তু—

কথাটা শেষ করে না সে। মিঃ চৌধুরী তাকে দেখে হাত নাড়ছেন—হ্যাল্লো!

তাঁর দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হাসল সুনীথ—গুড মর্নিং সার।

—ভেরি গুড মর্নিং। প্রসন্ন হাসিতে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে তাঁর ভরাট মুখটা।

চীফ ইনস্ট্রাকটারের ঘর থেকে আজ হাসির শব্দ উঠছে ঘন ঘন। খুব জমাট আসর বসে গেছে ওখানে। এমনিতে বেশ রাশভারি গম্ভীর মানুষ মিঃ ব্যানার্জী। ক্যাডেট পাইলটদের সঙ্গে প্রয়োজনের চেয়ে একটাও বেশি কথা বলেন না, কিন্তু পুরনো বন্ধুবান্ধব বা সিনিয়ার পাইলটদের পেলে একেবারে অন্য মানুষ। ঠাট্টা রসিকতায় মশগুল হয়ে যান তখন। বোঝাই যাচ্ছে, আজ খুব খুশির মেজাজ তাঁর।

সুনীথ একটা সিগারেট ধরিয়ে মাঠের দিকে তাকায়। সকালের উজ্জ্বল

আলো ক্রমশ প্রখর হয়ে উঠছে এখন। ফাঁকা রানওয়েটা ঝিকমিক ঝিকমিক করে জবলছে। বৃষ্টি-ভেজা ঘাসগুলো ঘন সবুজ। ঘাসফুলের অজস্র সাদা কুঁড়িতে ভরে যাওয়া বিশাল মাঠ। কী সুন্দর সকালটা আজ!

মৃদু হাওয়া বইছে। আকাশে হাল্কা মেঘের স্রোত। কণ্ট্রোলের মাথায় হাওয়া মাপার যন্ত্রটা ঘুরছে সিল্-সিল্, সিল্-সিল্। ধ্রুব দত্ত তার বান্ধবীকে নিয়ে টাওয়ারের নিচেয় পায়চারি করে। ছটুলাল প্রপেলার ঘুরিয়ে ডিয়ারের ইঞ্জিন চালু করতে যাচ্ছে। সুনীথ এক দৃষ্টিতে চুপচাপ মেশিন দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

গোটা এয়ারপোর্টটা যেন উজ্জবল হয়ে জেগে উঠে তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছে। চারদিক থেকে একটা চাপা শব্দ, একটা পরিচিত নেশা ধরানো গন্ধ, একটা অশরীরী স্পর্শ তার চেতনার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল।

একটু পরেই ডিয়ারের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। গাঁ-গাঁ শব্দ তুলে মেশিনটা ভাল করে গরম করে নিচ্ছেন ডেভিড। দাশগুপ্ত ইতিমধ্যে কখন উঠে গিয়ে তাঁর পিছনে বসে পড়েছে। মিঃ ব্যানার্জী বসলেন জিকের কক্পিটে। তাঁর পিছনের সীটে জয়ন্ত।

দেখতে দেখতে দুটো মেশিন আকাশে ভেসে পড়ল। সারকিটে একটা পাক দিয়ে জোড় বেঁধে আরও ওপরে উঠতে শুরু করল তারা। এক জোড়া ফড়িং-এর মতো উড়তে উড়তে প্রায় মেঘের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

রানওয়ের এ-পাশে বড় মাঠের মধ্যে চেয়ার পেতে বসে আছেন কয়েকজন। একটা ছোট ত্রিপল টাঙানো হয়েছে সেখানে। ক্লাবের সাদা ফ্ল্যাগ উড়ছে এক পাশে। পায়ে পায়ে সবাই সেখানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এবার। ফ্ল্যাগটাকেই প্রথম স্যালুট করতে এগিয়ে আসবে প্লেন দুটো। ফাংশানের দিন ওখানে নিমন্ত্রিত অতিথিদের বসবার ব্যবস্থা হবে। এই জায়গাটাকে কেন্দ্র করেই তাই চলবে আজকের বিমান মহড়া।

রিখি বললেন—চল সানিথ, এবার ওদিকে যাওয়া যাক। সুনীথ আকাশের দিকে তাকিয়ে তখনো অদৃশ্য মেশিন দুটোকে দেখবার চেষ্টা করছিল। রিখির কথায় নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। মিঃ চৌধুরীও উঠলেন তাঁদের সঙ্গে।

ত্রিপলের নিচে বসে আছেন ক্লাবের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ মজুমদার। তাঁর পাশে আরও সব সিনিয়ার মেম্বাররা। মেয়ে-পুরুষ ছেলেছোকরায় মিলে একটা গুন গুন করা জটলায় মুখর হয়ে উঠেছে জায়গাটা। ফ্ল্যাগ পোস্টের পিছনে সলিল দাশ, ধ্রুব দত্ত ও ক্লাবের আরও অনেকে। নতুন ব্যাচের পুরো দলটাও সেখানে। পুরোপুরি একটা জমকালো উৎসবের মতো চেহারা।

একটু পরেই বাচ্চার দল হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল। ক্ষুদে ক্ষুদে প্লেন দুটোকে দেখতে পেয়েছে তারা। উত্তর দিক থেকে কোনাকুনি ডাইভ দিয়ে এগিয়ে আসছে মেশিন দুটো। জোড়া পাখির মতো ঝাঁপ দিয়ে একেবারে ফ্ল্যাগ পোস্টের সামনে নেমে পড়েছে। ছেলেরা উঠে দাঁড়িয়ে কেউ রুমাল, কেউ টুপি নাড়ছে পাইলটদের উদ্দেশ্যে। হেলমেট পরা মাথাগুলো এবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তারা।

মিঃ চৌধুরী পাইপ টানতে টানতে বললেন—দেখেছেন কাণ্ড, দাশগুপ্ত কী পরিমাণ কুশান পেতেছে সীটে, মাথাটা কক্‌পিটের কত ওপরে!

সুনীথ সেদিকে লক্ষ করে বলল—দাশগুপ্তর বরাবর একটু উঁচু সীট পছন্দ, সার।

—নো, এটা ঠিক নয়। চৌধুরী মাথা নাড়লেন।

ফ্ল্যাগ পোস্ট ছাড়িয়েই আবার এয়ারক্র্যাফ্‌ট দুটো মাথা উঁচু করে ওপরে উঠতে লাগল। খানিকটা উঠেই হঠাৎ দু'খানা দু'দিকে বেঁকে গেল। জোড়ার মাঝখান থেকে চিরে তাদের দু'জনকে যেন দু'দিকে আলাদা করে দিল কেউ। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজটাও ভেঙে দু'টুকরো হয়ে দু'দিকের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

সমবেত অভিবাদনের পর এবার ওরা আলাদা আলাদা ভাবে কসরত দেখাবে। মিঃ ব্যানার্জীর প্লেনটা উঁচুতে উঠতে উঠতে পশ্চিম দিকে সরে গেল। ডেভিড বাঁক নিয়ে আবার ফিরে আসছেন। আবার নিচেয় নামছেন তিনি। আরও নিচেয়।

ডিয়ারের গায়ের লেখাগুলি স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে এখন। হঠাৎ পেট উল্টে চিত হয়ে পড়ল ডিয়ার—'ইনভার্টেড ফ্লাইং'। মিঃ চৌধুরী তারিফ করে উঠলেন—ফাইন শো! পাইলটদের শোনার সম্ভাবনা না থাকলেও আনন্দে হাততালি দিচ্ছে ছেলেরা।

—ওঃ, আমি বেশিক্ষণ দেখতে পারি না এটা, রিখি কানের পাশে ফিস ফিস করে ওঠেন—আমার কেমন মাথা ঘুরে যায়, সানিথ।

মাটির দিকে ঝুলতে ঝুলতে আরও কিছুক্ষণ উড়ে চললেন ডেভিড। কক্‌পিটের সামনে তিনি, পিছনে দাশগুপ্ত। উল্টো চোখে এখন পৃথিবীটা দেখছেন ওঁরা। পায়ের নিচেয় আকাশ, মাথার ওপর মাটি—ঘরবাড়ি, গাছপালা, মানুষের জগৎ। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি।

আরও খানিকটা এগিয়ে একটা মোচড় খেয়ে সোজা হল ডিয়ার। সোজা হয়েই আবার শরীরটা মুচড়ে মুচড়ে পাক খেতে লাগল। 'রোল' করছেন

ডেভিড। দিগন্ত রেখায় মুখ রেখে দড়ি পাকানোর মতো প্লেনটা ঘোরাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের শব্দটাও আঁ-আঁ করে কেমন মোচড় খেয়ে ওঠে। একটা তীব্র আর্তনাদে যেন কাতরে কাতরে উঠছে ডিয়ার।

ডেভিডের প্লেন দৃষ্টির বাইরে যেতেই ব্যানার্জীকে দেখা গেল আবার। 'স্পিন' করে ঘুরতে ঘুরতে ওপর থেকে নেমে আসছেন। হাজার ফুটের কাছাকাছি থাকতেই আবার সোজা হলেন তিনি। একটু পরে তিনিও 'ইনভার্টেড ফ্লাইং' দেখালেন।

তিনি সরে যেতেই আবার আর একদিক থেকে ডেভিড এগিয়ে এলেন। 'লুপ' শুরু করেছেন ডেভিড।

ওপর থেকে ডাইভ দিয়ে পড়েই সোজা তীরের মতো আকাশে উঠছেন। উঠতে উঠতে শূন্যের মধ্যে একটা ডিগবাজী খেয়ে ঘুরে আবার নিচেয় নামছেন। এইভাবে একটা, দুটো, তিনটে 'লুপ' তৈরি করলেন তিনি। সবার চোখে বিস্মিত দৃষ্টি। আর একটা 'লুপ' করতে গেলেই মাটিতে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা। বাচ্চারা ভয়ে আনন্দে হৈ হৈ করে লাফাতে শুরু করেছে। ক্লাবের নতুন ছেলেরা পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে—ওয়ান মোর, ওয়ান মোর—আর একটা লুপ চাই, আর একটা—

ডেভিড যেন তাদের কথা মতোই ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে আর একটা 'লুপ' শুরু করলেন।

মিঃ চৌধুরী উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—ও গড!

রিখি উত্তেজনায় সুনীথের একটা হাত চেপে ধরেছেন। সুনীথও অবাক। রোমাঞ্চের বিদ্যুৎ ছড়িয়ে যাচ্ছে শিরায় শিরায়।

অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে ডেভিড চতুর্থ 'লুপ'টাও পূর্ণ করলেন। মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানে থেকে, মাটিতে নিশ্বাস ফেলে যেন মুখ ঘুরিয়ে আবার সোজা ওপরে উঠে গেল ডিয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পড়তে শুরু করল চারদিকে। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে বড়দের অনেকেও এবার বাচ্চাদের মতো হাততালি দিতে আরম্ভ করেছে। স্প্লেনডিড! ওয়াণ্ডারফুল! ডেঞ্জারাস! নানা ধরনের আবেগপূর্ণ মন্তব্য শোনা যায় তাদের মুখ থেকে।

তীক্ষ্ম আওয়াজে আকাশ কাঁপিয়ে আবার ওপরে উঠে যাচ্ছেন ডেভিড। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুনীথ তাঁর প্লেনের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। বুকের মধ্যে তোলপাড় করা এক দুরন্ত আবেগ। মনে হয় দর্শকদের এই ভয়ার্ত বিহ্বলতা, এই অভিনন্দন তারও প্রাপ্য ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে এখন এর নিষ্ক্রিয়

দর্শকমাত্র। এই ভীষণ চমকপ্রদ ঘটনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। একটা চাপা হতাশার অনুভূতিতে ভারি হয়ে আসে মন।

সবার দৃষ্টি এখন ডেভিডের প্লেনের দিকে। পুরো শক্তি নিয়ে গর্জন করতে করতে সোজা আকাশে উঠে যাচ্ছে ডিয়ার। দু'পাশে পাতলা মেঘের খণ্ড, তার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে। কিন্তু সোজাসুজি আকাশমুখী হতে গিয়ে হঠাৎ নিচের দিকে ধপ করে পড়ে যায়। ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেল, গতিহীন নিষ্প্রাণ ডিয়ার এবার একখানা কাটা ঘুড়ির মতো টলতে টলতে নেমে আসছে। ডেভিড 'স্পিন' করাতে শুরু করলেন মেশিনটাকে। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খেলা।

কণ্ট্রোল স্টিকটা পিছনে টেনে ডানদিকের রাডার পুরো চেপে ধরেছেন। ঘূর্ণির মতো আকাশে ঘুরছে ডিয়ার। আবার সেই গা-ছমছম করা দৃশ্য। নিম্নমুখী প্লেনটা বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে। বড় বেশি নিচেয় চলে এসেছে ডিয়ার। মাটি থেকে মাত্র আর কয়েক শো ফুটের দূরত্ব। এত নিচেয় নেমে কেউ 'স্পিন' করে না। এই ঘূর্ণি থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে হলে ডাইভ দিয়ে গতি বাড়িয়ে নিতে হয় প্লেনের। কিন্তু ডেভিড সে উচ্চতাটুকুও যেন রাখলেন না।

সাঁই সাঁই করে এখনো নেমে আসছে ডিয়ার। আরও নিচেয়।

—ও, নো! সিনিয়ার পাইলটদের মধ্যে কে যেন একজন চিৎকার করে উঠল। মিঃ চৌধুরীর মুখেও এক অস্ফুট শব্দ। ভয়ে বিবর্ণ রিখির মুখ। সুনীথও কাঁপছে থরথর করে। বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে! গুম গুম করে লাফিয়ে উঠছে হৃৎপিণ্ড।

আর সময় নেই। শেষ মুহূর্তটাও যেন পেরিয়ে গেল। পরের দৃশ্যটা কল্পনা করতেও বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। ডেভিড ডাইভ দিলেন এবার। কিন্তু হায়! যা ঘটবার তাই ঘটে গেল। প্রচণ্ড বেগে সোজা মাটিতে মুখ আছড়ে পড়ল ডিয়ার। একটা ভয়ংকর আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন।

ত্রিপলের নিচে থেকে সবাই হুড়মুড় করে পালিয়ে আসছে পিছনে। রিখি জোর করে সুনীথকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। ক্ষীণ একটা আর্তনাদ করে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালেন তিনি। সুনীথের পা দুটো যেন মাটির মধ্যে বসে যাচ্ছে, সমস্ত শরীরে এক অসাড় অনুভূতি। তার চোখের সামনে আগুনে পুড়ছে ডিয়ার। বেল্ট বাঁধা শরীর দুটো তখনো ছটফট করছে কক্‌পিটের মধ্যে। সামান্য ছটফট করেই কেমন স্থির হয়ে গেল।

ডেভিডের মাথা নোয়ানো। জীবনের শেষ মুহূর্তে কাউকে যেন প্রণাম জানাচ্ছেন তিনি।

মুহূর্তে সুনীথের সম্বিৎ ফিরে আসে। সে ভিড় কাটিয়ে ছুটে যেতে চায় ডেভিডের কাছে। মিঃ চৌধুরী তার রাস্তা আটকালেন। এক ধাক্কায় সে চৌধুরীর বিশাল শরীরটা মাটিতে ফেলে দিতে চায়। কিন্তু শক্ত হাতে তাকে জড়িয়ে ধরেছেন তিনি—ডোণ্ট গো, ডোণ্ট গো দেয়ার মাই ফ্রেন্ড, প্লীজ হ্যাভ পেশেন্স—

সুনীথ অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে জ্বলন্ত প্লেনটার দিকে। ডেভিডের পুরো শরীরটাই এখন আগুনের মধ্যে। মিঃ চৌধুরী গম্ভীর গলায় বলে চলেছেন—দিস ইজ দ্য গ্লোরিয়াস এণ্ড অফ এ পাইলটস্ লাইফ, মাই ফ্রেন্ড! ওদের বাঁচাবার এখন আর কারো সাধ্য নেই। য়ু ক্যান নট হেল্প্ দেম নাউ। ওখানে ছুটে গিয়ে শুধু নিজের মৃত্যুকেই ডেকে আনবেন আপনি। শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বরং এখন সম্মান জানাতে চেষ্টা করুন ওঁদের। প্রার্থনা করুন, মৃত্যুর পর যেন ওঁদের আত্মা শান্তি লাভ করে!

মিঃ চৌধুরী আরও জোরে চেপে ধরেন তাকে। তাঁর গলায় যেন মন্ত্র উচ্চারণ করার মতো এক গম্ভীর আবেগ। সুনীথের চোখ দুটো জ্বালা করে। গলার কাছে একটা দলা পাকানো কান্নার অনুভূতি। সেই অবস্থায় সে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা ফোম দিয়ে জ্বলন্ত প্লেনটা ঢেকে দিয়েছে। ট্যাঙ্ক ভর্তি পেট্রলের ছড়ানো আগুন এখনো লাফিয়ে উঠছে এদিকে ওদিকে। তার মধ্যে শেষবারের মতো সে ডেভিডের দেহটা একবার দেখতে চেষ্টা করল।

এখনো তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন তিনি। আগুনে ঝলসানো মাথাটা সামান্য নোয়ানো, হাতে ধরা কণ্ট্রোল স্টিক। মৃত্যুর পরও যেন তিনি উড়ে চলেছেন। হয়ত এই পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য এক দেশে!

এয়ারফোর্সের গাড়িতে ছেয়ে গেছে চারদিক। পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, অ্যাম্বু-লেন্স। স্কোয়ান লীডার মূর্তি এগিয়ে এলেন অ্যাম্বুলেন্সের লোকদের নিয়ে। রিখিকে ধরাধরি করে তোলা হল অ্যাম্বুলেন্সে। মিসেস মৈত্রও গেলেন তাঁদের সঙ্গে।

পুলিশ কর্ডন করে ঘিরে ফেলল মাঠটাকে। কণ্ট্রোল টাওয়ারের মাথায় বিপদ সংকেতের লাল আলো। লাল হয়ে যাওয়া এই বিমান বন্দরে আর কেউ নামতে পারবে না এখন। মিঃ ব্যানার্জীকে এখন অন্য কোন বিমান বন্দরে চলে যেতে হবে।

ক্লাবের পতাকা অর্ধনমিত করে দিলেন মিঃ মজুমদার। মিসেস গাঙ্গুলী কান্নায় ভেঙে পড়েছেন এক পাশে। তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন অন্য একজন। সুলতান ট্রে ভর্তি কোকাকোলা নিয়ে এসেছিল কারো জন্যে। কেউ সে বোতল নিল না এখন। ট্রে হাতে চুপচাপ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখ দুটো ছলছলে। হাতে ধরা বোতলগুলো কাঁপছে ঠক ঠক, ঠক ঠক করে।

একে একে সবাই সরে আসছে মাঠ থেকে। এয়ারফোর্স সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছে পিছনে। পুরনো মেম্বাররা অনেকে অফিস ঘরে এসে বসলেন এবার।

জুয়েলদা চোখে রুমাল চেপে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে একজন ধরে নিয়ে গেলেন ভিতরে। ধ্রুব দত্ত তার বান্ধবীকে নিয়ে স্কুটারে স্টার্ট দিল। মিঃ গাঙ্গুলীর গাড়িও গেল তার পিছন পিছন। সুনীথ এক পাশে দাঁড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ দেখতে চাইছিল দৃশ্যটা। মিঃ চৌধুরী এবার তাকে জোর করে সরিয়ে আনলেন।

ফিউনারাল প্রসেশান শুরু হতে এখনো পুরো একটা দিন। তার আগে অনেক কিছু ফর্মালিটি বাকি। বিষণ্ণ মুখে আস্তে আস্তে অনেকেই চলে যাচ্ছে। ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসছে ক্লাবটা। কণ্ট্রোলের বারান্দায় এরোড্রম অফিসার মেহরোত্রা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দূরের দিকে। তাঁর মুখে জ্বলন্ত সিগার। জীবনে এরকম অনেক দৃশ্যই তাঁকে দেখতে হয়েছে। হয়ত চুরুট টানতে টানতে সেই কথাটাই ভাবছিলেন তিনি।

ক্যাণ্টিনের বারান্দায় সিগারেট হাতে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইল সুনীথ। মাথার ওপর জমাট মেঘে ঢাকা দুপুরের সূর্য। একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব ছড়ানো চারদিকে। খাঁ খাঁ করছে রানওয়ে। মাঠের মধ্যে ডিয়ারের ভগ্নস্তূপটা এবার ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ক্রমশ। ওর মধ্যে এখনো বসে আছে দাশগুপ্ত। হাসি-খুশি, সরল অমায়িক। গানের গলা ছিল সুন্দর। স্বপ্ন দেখত, পাইলট হয়ে একদিন দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবে।

বসে আছে আর একটি শবদেহ। মাত্র কিছুক্ষণ আগেও যাঁর পরিচয় ছিল. স্কোয়াড্রন লীডার ডেভিড, বয়স আটত্রিশ, বিবাহিত, নিঃসন্তান—এয়ারক্র্যাফটকে যিনি তাঁর স্ত্রীর মতো ভালবাসতেন। যাঁর য়ুনিফর্মের সঙ্গে লাগানো ছিল সোনালী ঈগল, বুকে সবুজ প্রজাপতির উল্কি......

হঠাৎ যেন ডেভিডের মুখটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে—লুক সানিধ, অঙ্কের খাতায় একবার ভুল করলে তুমি তা আবার ঠিক করতে পার, কিন্তু ইন ফ্লাইং—তুমি যদি একবার ভুল করে ফেল তাহলে তা আর শোধরাবার সুযোগ পাবে না। রাইট?

সুনীথের চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। ডেভিড কি জানতেন, তাঁকে জীবন দিয়ে কথাটা প্রমাণ করে দেখাতে হবে একদিন?

সুনীথ উঠে দাঁড়াল এবার। তার কানের মধ্যে এখনো ডিয়ারের শেষ আর্তনাদ। সমস্ত বিমান বন্দরের মাঠ, রানওয়ে, কণ্ট্রোল টাওয়ার, সব কিছুর মধ্যে থেকেই যেন সেই আর্তনাদের একটা করুণ রেশ ভেসে উঠতে থাকে। চারদিক থেকে পরিবেশটা তাকে যেন ঘিরে ফেলে। জড়িয়ে ধরে আঘাত করতে থাকে।

এর আগে শেষ দিন যখন সে ক্লাব থেকে গিয়েছিল, ডেভিড বলেছিলেন—কাম এগেন। সে এসেছিল, কিন্তু ডেভিড তা জানলেন না।

অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে শেষবারের মতো সে ডেভিডকে অভিবাদন জানাল—সার, আই'ল নেভার ফরগেট য়ু! নেভার! আই লাভ য়ু! নাউ গুড বাই সার, গুড বাই—

তারপর ধীরে ধীরে বিমান বন্দর ছেড়ে সে বরাবরের মতো চলে গেল।

এগারো

রিখি চলে গেলেন এর দশ দিন পর। ফিউনারাল প্রসেশানের পর সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা সুনীথের।

বাবার সঙ্গে এলাহাবাদ ফিরে গেলেন তিনি। সুনীথ খোঁজ নিতে গিয়ে দেখল, জিনিসপত্র গোছগাছ সারা। পরদিন রাত্রেই ট্রেন। সুনীথকে দেখে তাঁর চোখে জল এসে গেল। বললেন—তুমি এসেছ সানিথ, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। যাবার আগে একবার তোমার সঙ্গে দেখা না হলে খুব আফসোস থেকে যেত। ডেভিড তো ভীষণ ভালবাসতো তোমাকে—আমার জন্যেও সে কখনো এতটা ভেবেছে কি না সন্দেহ!

পলকের জন্যে একটা ম্লান রেখা দেখা দেয় তাঁর মুখে। এ ক'দিনেই মুখের দীপ্তি কেমন নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। কালো বর্ডার লাগানো নতুন ফ্রক পরেছেন একটা। অবিন্যস্ত চুল, টলটলে সজল চোখ। শোকাহত বিষণ্ন মূর্তি। সুনীথ তাঁর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। বলার মতো কিছুই খুঁজে পায় না।

খানিক পরে বেয়ারা একটা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখে গেল তাদের সামনে। রিখি একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেটা টেনে নিতেই সুনীথ বাধা দেয়—নো, আই'ল ডু ইট ফর য়ু টু ডে। আমি আজ তৈরি করে দি এটা। অন্তত আজ।

রিখি হাত সরিয়ে নিলেন। বিষণ্নতার মধ্যেও একটুখানি হাসির আভা ফোটে তাঁর চোখে—বেশ তাই করো, যদি খুশি হও তুমি।

সুনীথ চা করতে শুরু করে। লিকার ঢেলে দুধ চিনি মিশিয়ে তাঁর দিকে একটা কাপ বাড়িয়ে দেয়। কাপটা হাতে করে রিখি বললেন—থ্যাংক য়ু ডিয়ার—

কথাটা বলে ফেলেই যেন থমকে গেলেন তিনি। মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

শব্দটা শুনে সুনীথও চমকে তাঁর দিকে তাকাল। হাত ফসকে চামচেটা নিচেয় পড়ে যায়। 'ডিয়ার' শব্দটা দূরাগত একটা আর্তনাদের মতো সহসা

তাদের দু'জনের কানের মধ্যে বাজতে থাকে। বুকের মধ্যে যেন একটা ছ্যাঁকা লাগার অনুভূতি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকে তারা। কেউ কোন কথা বলতে পারল না অনেকক্ষণ।

চলে আসবার আগে সুনীথ একখানা ছবি চাইল ডেভিডের। রিখি উঠে গিয়ে বড় একটা অ্যালবাম এনে বললেন—তোমার যেটা ইচ্ছে বেছে নাও, সানিথ।

অ্যালবামটা নিয়ে বসে বসে পাতা ওলটায় সে। অধিকাংশই রিখি আর ডেভিডের ছবি। বিভিন্ন পরিবেশে নানা ধরনের মেজাজের প্রতিকৃতি। দেখতে দেখতে একটা প্রচণ্ড আবেগে ধ্বক ধ্বক করে তার বুক। শরীরটার ভিতরে কোথাও যেন কেঁপে ওঠে থেকে থেকে। অবশেষে অ্যালবাম থেকে দুটো ছবি খুলে নিল সে।

একটাতে রিখি আর ডেভিড নাচের আসরে দাঁড়িয়ে। দু'দিকে বাঁকানো দু'জনের শরীর। ডেভিডের চোখেমুখে কৌতুক। রিখি হাসছেন উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে। সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর হাসির ঢেউ।

দ্বিতীয়টা শুধু ডেভিডের। পোস্ট কার্ড মাপের একখানা সুন্দর স্টিল। পুরো য়ুনিফর্ম পরা, কাঁধে স্কোয়াড্রন লীডারের ব্যাজ, বুকে ঈগল, তার নিচেয় দু' সারি ডেকরেশান। একটা গর্বিত আনন্দে উদ্ভাসিত মুখ। দু'চোখে কৌতুক ভরা উজ্জ্বল দৃষ্টি। অ্যাকাডেমিতে ইনস্ট্রাকটার থাকার সময় তাঁর কোন এক ছাত্রের তোলা। সুনীথ নেশাগ্রস্তের মতো ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

রিখি তাঁর নাচের ছবিটার দিকে দেখে বললেন—এটাও নেবে? কিন্তু এটা তো তেমন ভাল নয়।

সুনীথ হাসল—আমার যে খুব ভাল লাগছে। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

—ও নো, নট অ্যাট অল, তুমি যেটা খুশি নিতে পারো।

একটু পরে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল সুনীথ। রিখি পায়ে পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ডেভিডের অ্যালসেশিয়ানটা একবার মুখ তুলে তাদের দেখে আবার মাথা নামিয়ে নিল।

বাগানে হু-হু করা ঝড়ের মতো হাওয়া। ঝাউপাতায় সেই দীর্ঘ নিশ্বাসের মতো সাঁই সাঁই শব্দ। বড় পাতাবাহার গাছটার পাশে একবার থেমে দাঁড়াল

সুনীথ। সম্ভবত এইখানে দাঁড়িয়ে সেদিন ঈশ্বরের সেই বিচিত্র ইচ্ছেটা পূরণ করেছিলেন রিখি। কথাটা মনে আসতেই যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় তার সারা শরীরে। ঘুরে দাঁড়িয়ে আর একবার সে রিখিকে দেখতে চায়।

স্থির দৃষ্টিতে এখনো তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। থমথমে বিষণ্ণ মূর্তি: সুনীথ হাত তুলে আর একবার নাড়ল। হাসল একটু। রিখিও হাত তুললেন। টলটল করছে তাঁর চোখ। হাসবার চেষ্টায় একটু যেন বিকৃত হয়ে যায় মুখটা। দূর থেকেই বললেন—বা-আ-ই—সুখে থেকো, ভাল থেকো, সানিথ!

কথাটা বলেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন ঘরের মধ্যে।

সুনীথ শেষবারের মতো সেই সুন্দর বাংলো, বাগান, গাছগাছালিগুলো দেখতে দেখতে নীরবে এগিয়ে চলল।

তারপর কত দিন যায়! কত পরিবর্তন ঘটে গেল চারিদিকে। তবুও সুনীথ ভুলতে পারে না কিছুই। বুকের গভীরে এক ধূসর ভগ্নস্তূপের মতো সব কিছু জমে থাকে।

অথচ এখন কত বদলে গেছে তার দিনগুলো। সারা সপ্তাহ একটানা কাজ আর ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়। কাকার অফিসের অধিকাংশ কাজকর্মই এখন তাকে সামলাতে হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে বাইরে বাইরে ঘোরে। বাড়ি ফেরার কোন ঠিক থাকে না। মা মৃদু অনুযোগ করেন মাঝে মাঝে: তবু সুনীথের এই পরিবর্তনে তিনি মোটামুটি খুশি। কাকাও তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবার। সে জীবনে একদিন ঠিক উন্নতি করবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

কিন্তু এক-এক সময় সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। হালকা কোন এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট উড়ে যাওয়ার শব্দে যখন বুকের মধ্যে সেই জমাট স্মৃতিগুলো ঘুলিয়ে ওঠে, স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে তখন ছড়িয়ে পড়ে শিরশিরে এক অনুভূতি।

কোথাও যেন একদল মৌমাছির উড়ে যাওয়ার শব্দ পায় সুনীথ। বাতাসে ছড়ানো সেই গুন গুন কেবলি তার বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। উৎসাহহীন এক অসাড় অনুভূতিতে তখন আর সব কিছু ভুলে যায় সে। চোখের সামনে স্বপ্নের মতো ভাসে বিশাল বিমান বন্দর, ফ্লাইং ক্লাব, কণ্ট্রোল টাওয়ার—এয়ারফোর্স স্টেশান। মৃদু গর্জনে ধীর গতিতে ঘুরছে ডিয়ারের প্রপেলার, ডেভিড তাকে কক্‌পিটে বসিয়ে সামনের আসন থেকে নেমে গেলেন, রিখি হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে, সকালের

উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে চারদিক, কণ্ট্রোল অলডিস্ ল্যাম্পের সবুজ সংকেত দেখাচ্ছে ঝলকে ঝলকে, দারুণ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে তার শরীর......

মুহূর্তের মধ্যে কেমন আত্মবিস্মৃত হয়ে যায় সুনীথ। নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো এক বিহ্বল দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে তার চোখেমুখে। পথ চলতে থাকলে এ সময় প্রায়ই তার গন্তব্যের কথা ভুলে যায়। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে উঠে বসে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে অনুভব করে বুকের মধ্যে সেই উত্তেজনার কম্পন।

কোন কোন দিন খুব ভোরে আকাশটা দেখলে তার এরকম মনে হয়: প্রকাণ্ড নীল আকাশটা যেন কী ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। অভিভূত হয়ে সে অনুভব করে, তার বুকের মধ্যে গুর গুর করে কেঁপে চলেছে সেই নিরুদ্ধ বাসনার গুঞ্জন।

এই অদ্ভুত অসুখটার হাত থেকে সে হয়ত কোনদিনই আর মুক্তি পাবে না। বুকের গভীরে এক গোপন আততায়ীর মতো তাকে সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে চলেছে এটা। হঠাৎ আকাশে এরোপ্লেন উড়ে যায় যখন, বিশেষত হালকা ধরনের কোন বিমান, তখনি মাঝে মাঝে চমকে উঠে সে অনুভব করে তার মধ্যে জেগে উঠছে সেই ধ্বনি। কখনো মৃদু কখনো তীব্র হয়ে। আর এই আশ্চর্য অনুভূতিটাই এখন তার একমাত্র সঙ্গী।

গত বছর সুধার বিয়ে হয়ে গেল। তার পছন্দ করা ছেলের সঙ্গে। যত দিন সুধা ছিল তবু একজন সঙ্গী ছিল। এখন বাড়িতে ফিরলে সে সম্পূর্ণ একা। কিছুদিন আগে চৈতীরও বিয়ে হয়ে গেল। মেরিন ইঞ্জিনীয়ার অমিতের সঙ্গে। নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে নিজে এসেছিল চৈতী। ভুরু বাঁকিয়ে হেসে বলেছিল —না গেলে কিন্তু ভীষণ দুঃখ পাব সুনীথ।

যাবো, বলে কথা দিয়েছিল। কিন্তু যাওয়া হয়নি। চৈতীরা এখন ওয়াল্টেয়ারে। সুন্দর জায়গা। চিঠি লিখেছে বিশেষ করে, সেখানে কয়েকদিন বেড়িয়ে আসার জন্যে।

এখনো তেমনি দুর্বোধ্যই রয়ে গেল চৈতী!

জয়দীপ এখন ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট। শিগগির অ্যাকাডেমি যাচ্ছে ইনস্-ট্রাকটার হতে। চিঠি দেয় মাঝে মাঝে। মা'র খোঁজে এর মধ্যে একবার হায়দ্রাবাদ ঘুরে এসেছে। দেখা পায়নি। চিঠিতে এখনো দুঃখ করে তাঁর জন্যে।

একবার তাকে লিখেছিল, তুমি কিন্তু ভুল করলে সুনীথ। ফ্লাইং ছেড়ে দেওয়াটা উচিত হল না তোমার। দেখো, একদিন ঠিক আফসোস করবে এর জন্যে।

জয়দীপের কাছে সব কিছু এখনো চ্যালেঞ্জের ব্যাপার।

রিখি চলে গেছেন কতদিন হয়ে গেল। আর কোন খবর নেই তাঁর। সুনীথের বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন তিনি নিশ্চয়ই চিঠি লিখবেন তাকে। অনেকদিন পর অবশেষে সত্যিই এল সেই চিঠিটা।

এখন তিনি দেরাদুনে এক কনভেণ্টের গানের টীচার। গান-বাজনার মধ্যে সময় কাটছে। দীর্ঘ চিঠির শেষে লিখেছেন—সানিথ, এক সময় মনে হতো গানই আমার কাছে সবচেয়ে বড়। এটা নিয়ে জীবন কাটাতে পারলেই বোধ হয় আমি সবচেয়ে সুখী হব। কিন্তু এখন দেখছি তা ঠিক নয়।

কিছুতেই ভুলতে পারছি না সেই উত্তেজনাভরা দিনগুলোর কথা। বিশেষত ডেভিডের মতো অমন একজন আশ্চর্য জীবন্ত পুরুষ যে জীবনের সংগী তা কি কখনো ভোলা সম্ভব? মনে পড়ে তোমার কথাও। ফ্লাইং ক্লাবের দিনগুলোই সম্ভবত আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। তোমরা সবাই মিলে আমার মনের মধ্যেও যেন একটা অদ্ভুত নেশা তৈরি করে দিয়েছ।

রিয়েলি সানিথ, আমি বোধ হয় একটা দিনের কথাও ভুলতে পারব না। আকাশে এয়ারক্র্যাফ্‌ট দেখলেই এখন মন খারাপ হয়ে যায়। ভীষণভাবে ডেভিডকে মনে পড়ে। যেন আকাশে উড়ছে সে। তুমিও আছ তার সংগে। এইভাবে একটার পর একটা দিন কাটছে আমার......

বাড়িতে ফিরে কোন কোন দিন এই পুরনো চিঠিগুলোকেই উল্টেপাল্টে আবার দেখে সুনীথ। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ডেভিডের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখে। সেই কৌতুকভরা উজ্জ্বল দৃষ্টি। কোথাও বিষণ্ণতার ছায়া নেই। দুচোখে ঠাট্টার ঝিলিক তুলে যেন বলছেন—টেক ইট ইজি, মাই বয়!

এক এক সময় ডক্টর সাহানীর কথা মনে আসে। ঝুপসি চোখে স্টেথোস্কোপ কানে তার বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। হঠাৎ যেন একবার উঠে দাঁড়িয়ে স্টেথোটা শূন্যের দিকে বাড়িয়ে ধরেন তিনি। তারপর যেন জয়দীপকে দেখতে পেয়ে তার বুকের ওপর। মুহূর্তের মধ্যে ভ্রূ দুটো লাফ মেরে উঠল সাহানীর,

—ইয়েস, দেয়ার ইট ইজ!

রিখির বুকেও কান পাতলেন কিছুক্ষণ। সংগে সংগে আগের মতোই চোখ কুঁচকে গেল তাঁর।

তারপর একে একে সবাইকে যেন দেখছেন সাহানী। এলোপাথাড়ি স্টেথোস্কোপ চালিয়ে ডেভিড, জয়দীপ, বিপাশা দেবী, চৈতী—যাকে সামনে পেলেন তাকেই। আর প্রতিবারই যেন সেই একই ভঙ্গিতে তাঁর লোমশ ভ্রূ দুটো নেচে নেচে উঠতে লাগল।

সুনীথের মনে হচ্ছিল, এদের সবার বুকেই হয়ত কোথাও না কোথাও লেগে রয়েছে এক রহস্যময় গুঞ্জন। যা কিছু ঘটে গেল, এবং যা কিছু ঘটল না—সবই বোধ হয় সেই আশ্চর্য শব্দের সুতোয় বাঁধা!

—